২০০২

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ◆ ২২তম সংখ্যা

৩১ মে, ২০০২ ঈসাব্দ

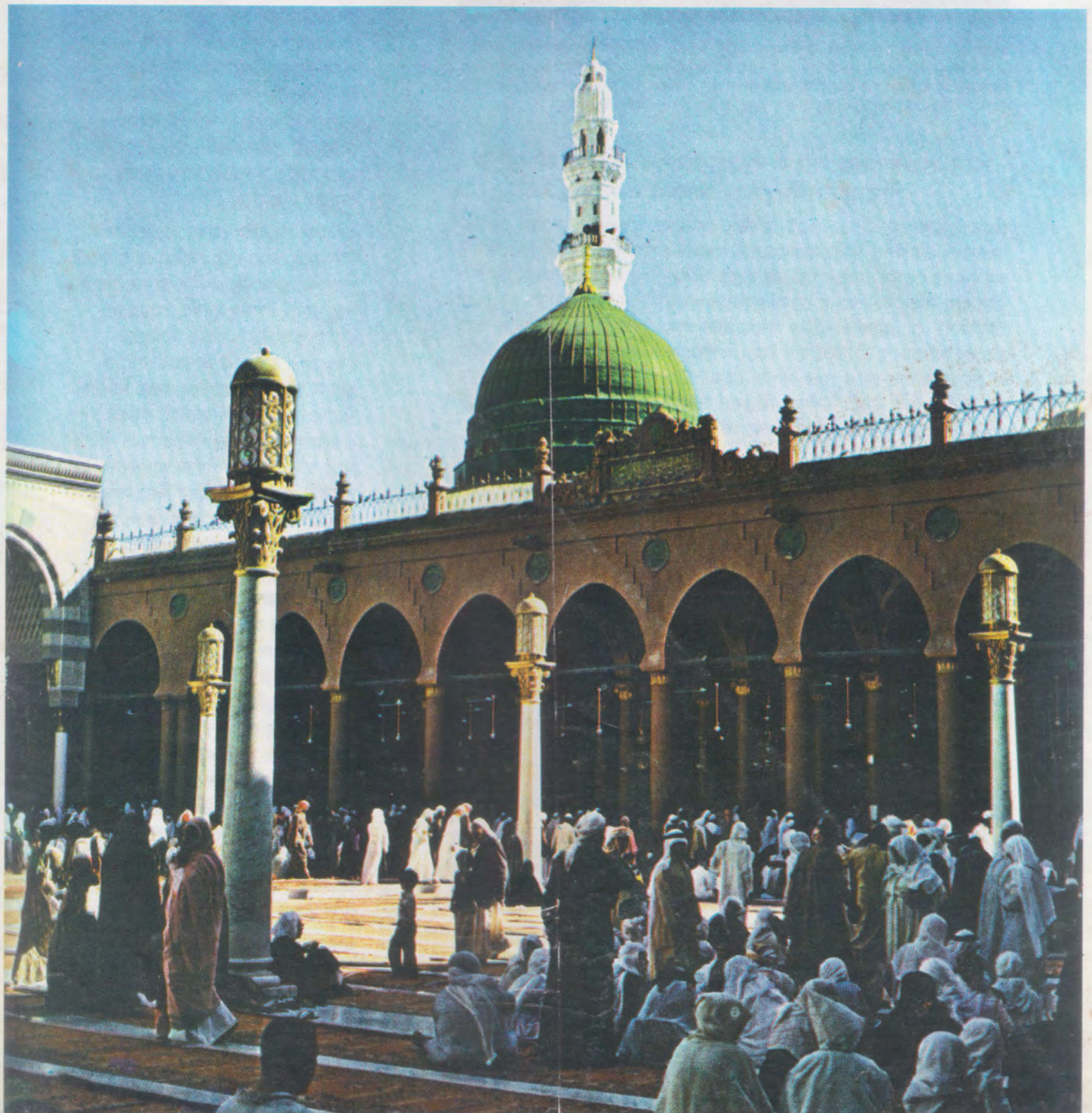

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২৬শে মে, ২০০২ ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত সীরাতুন্নবী জলসায় বক্তব্য রাখছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব পাশে উপবিষ্ট আছেন ঢাকা জামাতের আমীর জনাব আফজাল আহমদ খাদেম ও মুরব্বী সিলসিলাহ্ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর একাংশ।

শান-শওকতের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে সীরাতুননবী (সঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

বিগত ২৬শে মে, ২০০২ ১২ই রবিউল আউয়াল আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন স্থানীয় জামাতে শান-শওকতের সাথে সীরাতুন নবী (সঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসাগুলোতে মহা নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। বর্তমান সমস্যাসংকুল বিশ্বে মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনাদর্শই যে আলোক বর্তিকা স্বরূপ সারা মানব গোষ্ঠীকে পথ দেখাতে পারে সকলের আলোচনায় তা বিমূর্ত হয়ে উঠে। এ পর্যন্ত ঢাকা, তেজগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ক্রোড়া জামাত থেকে খবর পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য লাজনা ইমাইল্লাহ্, ক্রোড়ার কোড়াবাড়ি হালকা একটি সীরাতুন নবী (সঃ) জলসার আয়োজন করে। বিভিন্ন জামাত থেকে সিরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠানের খবর আসা অব্যহত আছে।।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চরসিন্দুর-এর মসজিদের সামনে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদের মাঝে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য় এবং অত্র অঞ্চলের তবলীগী আহবায়ক ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা জনাব এ কে রেজাউল করীম সাহেবকে দেখা যাচ্ছে।

তাদের কাজ পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় (সূরা শূরা ঃ ৩৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে আগামী ৭-৮ জুন, ২০০২ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ২৪তম জাতীয় মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। হুযূর (আইঃ) তাঁর পক্ষ থেকে খাকসারকে শূরা পরিচালনার জন্যে প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন।

শূরাতে যাতে সকল জামাতের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন সেজন্যে সকল জামাতের কর্মকর্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কেননা, শূরায় যোগদান করা প্রত্যেক জামাত ও প্রতিনিধির নৈতিক দায়িত্ব। প্রত্যেক জামাত থেকে প্রতিনিধিগণের তালিকা সত্বর সেক্রেটারী শূরার নিকট পৌছা প্রয়োজন। শূরার সার্বিক সফলতার জন্যে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আমাদের তবলীগী-বছরের আর ৩ মাসও বাকী নেই, অথচ হুযূর (আইঃ) প্রদত্ত টার্গেট পুরো করতে আমরা এখনও অনেক পেছনে পড়ে রয়েছি। সকল মুরব্বী, মোয়াল্লেম, জামাতের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ ও জামাতের আপামর ভ্রাতা ও ভগ্নীকে তবলীগের ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে নিষ্ঠা ও দোয়ার সাথে তবলীগী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্যে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তৃণ-মূল পর্যায়ে আপনাদের তবলীগী কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দিন। সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে কেবল মাত্র পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলার নাম নিয়ে কাজ করে যান। মু'মিন সমাজ যখন পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্র নামকে সমুন্নত করার জন্যে মরণপণ করে কাজে ব্রতী হয়, তখন দুগ্ধবতী মায়ের দুগ্ধে বান ডাকার ন্যায় আল্লাহ্তাআলার রহমতের বান ডাকে। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং ঐকান্তিকভাবে কাজে নামলে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে পারি ও পালন করতে পারি এবং হুযূর (আইঃ)-আমাদের নিকট যে আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তা যেন আমরা পুরো করতে সক্ষম হই, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ২২তম সংখ্যা

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ১৮ রবিউল আউয়াল ১৪২৩ হিঃ কাঃ
৩১ হিজরত ১৩৮১ হিঃ শাঃ ৩১ মে, ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	-	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

নবী করীম (সঃ)-এর মর্যাদা চির অক্ষয় ও চির অক্ষুণ্ন

আল্লাহ্‌তাআলার 'রহমান' সিফতের বিকাশের ফলশ্রুতিতে যুগে যুগে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে এবং বিভিন্ন ভাষা নির্বিশেষে আল্লাহ্‌তাআলা নবী-রসূল পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু কোন নবী বা রসূলকেই সমসাময়িক লোকেরা 'আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা' বলে সাদরে গ্রহণ করে নেয় নি। বরং সবার ভাগ্যেই গালি-গালাজসহ মিথ্যাবাদী, লোভী, ভন্ড, ধোঁকাবাজ, প্রতারক, যাদুকর, পাগল প্রভৃতি বিশেষণ জুটেছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, যাঁকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন- **লাওলাকা লামা খালাক্‌তুল আফলাক** অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ!) তোমাকে সৃষ্টি না করলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না, তিনিও এসব তথাকথিত পদবী প্রাপ্তি থেকে রেহাই পান নি। আর আল্লাহ্‌তাআলাও তাঁর কালামে পাকে এ প্রসঙ্গে আফসোস করে বলেছেন, **ইয়া হাসরাতান 'আলাল 'ইবাদি মা ইয়া'তীহিম মির রসূলিন ইল্লা কানূ ইয়াস্‌তাহযিউন** অর্থাৎ পরিতাপ! বান্দাদের জন্যে, তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নি যার প্রতি তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নি (সূরাতু ইয়াসীন ঃ ৩১)।

নবী করীম (সঃ)-কে গালি দেয়া ছাড়াও এমন কোন অত্যাচার নেই যা তাঁর ওপরে করা হয় নি; এমন কি তাঁকে প্রাণে মারার জন্যেও চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছে মদীনায়। তাঁর (সঃ) পবিত্র জীবনী পাঠ করলে এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না যে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে (সঃ) গালি-গালাজ ও অত্যাচার করার প্রতিশোধ হিসেবে তিনি কাউকে শাস্তি দিয়েছেন বা হত্যা করেছেন, অথবা সাহাবা কেরামকে (রাঃ) আদেশ দিয়েছেন গালিদাতাকে হত্যা করার জন্যে। তায়েফে চরম ও অমানুষিক নির্যাতন শেষে ফিরে আসলে শুধু শাস্তির ফিরিশ্‌তাকে তায়েফবাসীদের শাস্তি দেয়া থেকে বিরতই করেন নি বরং তায়েফবাসীদের জন্যে পরম করুণাময়ের নিকট দোয়া করেছেন ঃ **আল্লাহুম্মাহ্‌দি কৃওমী ফাইন্নাহুম লা ইয়ালামূন**- হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জাতিকে সুপথ দেখাও কেননা, তারা বুঝে না। প্রত্যক্ষভাবে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, মুসলমানদের হত্যা করেছে বা চুক্তি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করেছে কেবল তাদের বেলায়ই তিনি শাস্তিস্বরূপ হত্যার আদেশ দিয়েছেন। তা-ও বিনা বিচারে নয়। কেননা, বিনা বিচারে কাউকে হত্যা করা কুরআনী শিক্ষার বিরোধী। মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই রসূল (সঃ)-কে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করলে হযরত উমর (রাঃ) তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। অথচ নবী করীম (সঃ) তাকে বিরত রাখেন। কোন প্রকার শাস্তির আদেশ দেন নি। পরবর্তীতে সেই চিহ্নিত মুনাফিককে তার পুত্র হত্যা করার অনুমতি চাইলে হুযূর (সঃ) তা-ও দেন নি। পরে অবশ্য তিনি তার (মুনাফিকের) পথ আগলিয়ে নবী করীম (সঃ) যে উৎকৃষ্ট সে স্বীকৃতি আদায় করেন।

বিগত ৬ই মে, ২০০২ এর দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় 'ইমাম কুরতুবী' নামক মধ্য যুগীয় এক বুযূর্গের 'নবী করীম (সঃ)-এর মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুণ্নকারীর শাস্তি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (অনুবাদকের নাম প্রকাশ করেন নি)। এ প্রবন্ধে সংগ্রাম কুরআনের কোন দলীল ছাড়াই কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যে, 'নবী করীম (সঃ)-কে কোন ব্যক্তি গালি দিলে তাকে হত্যা করতে হবে'। সংগ্রামের জানা উচিত এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই বরং রহমাতুল্লিল আলামীনের (সঃ) ওপরে জঘন্য অপবাদ আরোপ করার ধৃষ্টতা দেখানো। এ প্রবন্ধে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যাতে দেখানো হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ)-কে গালি দেয়ার কারণে কোন কোন সাহাবী গালিদাতাকে হত্যা করেছে। এতদ্‌দ্বারা সাহাবীদের ওপরেও কলঙ্কের বোঝা চাপানো হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি রসূল (সঃ)-কে গালি দিলে ও অকথ্য ভাষা ব্যবহার করলে হযরত আবূ বুরজা আসলামী তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) আবূ বুরজাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'এ অধিকার আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-এর জন্যে নির্দিষ্ট।' সুতরাং সংগ্রাম এতদিন পরে মধ্যযুগীয় এক আলেমের কতকগুলো স্ববিরোধিতাপূর্ণ কথার প্রেক্ষিতে কি করে এ সিদ্ধান্ত নেন যে, রসূল (সঃ)-কে গালি দিলে তাকে হত্যা করতে হবে- আমাদের বোধগম্য নয়।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কোন দুর্মুখ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গালি দেবার সাহস দেখায় নি বা ভবিষ্যতেও দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। আর যদি গালি দেয়ও তাহলে তাকে পাগল বলা ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে। নবী করীম (সঃ)-এর শিক্ষানুযায়ী কেউ তাকে হত্যা করার দায়িত্ব নিতে পারে না। কেননা, উক্ত প্রবন্ধে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কথাকে উদ্ধৃত করেও বলা হয়েছে-এর অধিকার আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-এর জন্যে নির্দিষ্ট। সুতরাং দেশের বর্তমান আইন শৃঙ্খলার অবনতির প্রেক্ষাপটে সংগ্রামের এ ধরনের লেখা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কী আর এ যে আগুনে ঘি এ ঢালার শামেল তা বলাই বাহুল্য। এ দেশে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও হিন্দু রসূল করীম (সঃ)-কে মানে নি, তাহলে কি সংগ্রাম তাদেরকে হত্যা করার উস্কানী দিতে চাচ্ছেন? আসল কথা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আদম সৃষ্টির আগ থেকেই সবচেয়ে অধিক প্রশংসিত। অতীতেও তিনি প্রশংসিত, আজও তিনি প্রশংসিত এবং ভবিষ্যতেও তিনি প্রশংসিত থাকবেন। তাঁর (সঃ) মকাম ও মর্যাদা চির অক্ষয় চির অক্ষুণ্ন।

আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা 'আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারিকা ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

-নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ হাদীস শরীফ ঃ কথা বলার পদ্ধতি	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
■ অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'আযীয' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৮
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	৯-১০
■ খিলাফত সম্বন্ধে শীয়া ও সুন্নী দৃষ্টি ভঙ্গী	ঃ জনাব আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	১১
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১২-১৩
■ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৪
■ ওয়াকেফী নও-এর শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা মূল ঃ ডঃ শামীম আহমদ, ইনচার্জ কেন্দ্রীয় ওয়াকফে নও বিভাগ	ঃ অনুবাদ- মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৫-১৮
■ নতুনদের পাতা		
● হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর তার পরিবারের উপরে অত্যাচারের ইতিবৃত্ত	ঃ ভাষান্তর - জনাব কওসার আলী মোল্লা	১৯-২২
● ঈর্ষা নিয়ে কথা	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	২২-২৩
● অদৃশ্য ওহীর বাস্তব রূপায়ন	ঃ মৌঃ মোঃ মজিদুল ইসলাম	২৪-২৬
● আল্লাহ্র এক নিদর্শন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘড়িলাল	ঃ মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী	২৭-২৮

প্রচ্ছদ ঃ মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নব্বী

শূরার প্রসঙ্গে নীতিগত কয়েকটি দিক নির্দেশনা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ ঃ

"যেসব প্রস্তাব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া বাতিল করে দিয়েছে সে সর্ম্পকে আঞ্জুমানের কারণও সাথে সাথে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিলো যেন অন্তরে এ প্রভাব না সৃষ্টি হয় যে, সদর আঞ্জুমান কতিপয় জরুরী কল্যাণপ্রদ প্রস্তাবকে চিন্তা-ভাবনা না করে এমনিতেই বাতিল করে দিয়েছে। আর যদি তাদের জবাব দেয়ার পরেও কোন প্রকার দুর্বলতা থেকে যেতো তাহলে জামাতের চিন্তা করার সুযোগ লাভ হতো এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সঠিক পরামর্শ লাভ হয়ে যেতো ... কারণ ব্যাখ্যা না করে বলা যেতে পারে না যে, কোন্ ভিত্তিতে তারা প্রস্তাবগুলোকে বাতিল করেছেন, প্রস্তাবগুলোকে বাতিল করে দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং এগুলোর জন্যে আবশ্যক যে, তারা ওগুলোকে বাতিল করার কারণও বর্ণনা করেন এবং প্রকৃতপক্ষে যদি তারা চিন্তা করেন তাদের নিজস্ব কল্যাণও এর মধ্যে নিহিত। যদি ঐসব প্রস্তাব শুনিয়ে দেয়া হয় এবং ওগুলোকে বাতিল করার কারণ বর্ণনা না করেন তখন লোকেরা বলবে, আঞ্জুমানের লোকদের বুদ্ধি কম, যে বিষয়ে তাদের সম্মান ও সুনাম ওগুলোকেও বাতিল করে দিচ্ছে। অতএব আঞ্জুমানের নাযের যদি পৃথিবীর দৃষ্টিতে কম বুদ্ধির লোকে পরিণত হতে না চান তাহলে তারা প্রস্তাবগুলো বাতিল করার সাথে সাথেই দলীল প্রমাণও উপস্থাপন করে যেন লোক বুঝতে পারে যে, কেবল ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে নয় বরং কোন ন্যায় কারণের ভিত্তিতে এগুলো বাতিল করা হয়েছে" (রিপোর্ট মজলিসে মুশভিরাত, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ১৬-১৮)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর নির্দেশ ঃ

"স্থানীয় ব্যবস্থাপনার অবশ্য কর্তব্য, শূরায় প্রস্তাবসমূহ পাঠানোর নিয়ম-কানুন কী সে সম্বন্ধে যেন তারা লোকদেরকে বলে দেয়। নীতি-বিরুদ্ধ যেসব প্রস্তাব আসবে ওগুলো তো আসলে বাতিল করে দেয়া হবে এবং এখানে উপস্থাপিত হবে না। আর রীতিমত যেসব প্রস্তাব এসে থাকে এগুলোর মধ্যে কিছু এমন হয়ে থাকে যেগুলোর সাথে মজলিসে মুশাভিরাতের কোন সম্পর্ক থাকে না বরং তাহলো কতগুলো ক্ষুদ্র বিষয়। এগুলো প্রশাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিছু তা আমার ধারণায় তাদের এলাকার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু যেহেতু বন্ধুদেরকে বলা হয় না যে, কী প্রকারের প্রস্তাব শূরাতে যাওয়া উচিত এজন্যে সেগুলোও এসে থাকে" রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত - ১৯৭৭ [(ছাপা হয়নি) পৃষ্ঠা ২-৩]।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নির্দেশ ঃ

"মজলিসের সভাপতির মাধ্যমে আমার নিকট আপীল করার অধিকার আপনাদের প্রত্যেকের রয়েছে। এই বলে আপীল করতে হবে যে, আমাদের জামাতের অমুক প্রস্তাব বাতিল করা হয়েছে। রীতি অনুযায়ী ইহা বাতিল করার কোন কারণ আমাদের দৃষ্টিতে ছিলো না। পরবর্তী শূরাতেই বা যখনই সুযোগ পাওয়া যায় এর ওপরে দ্বিতীয়বার চিন্তাভাবনা করার জন্যে আমাদেরকে সুযোগ দেয়া হোক" (মজলিসে মুশাভিরাত উপলক্ষ্যে ব্রাসেলস-এ প্রদত্ত ৯-৯-১৯৯২ তারিখের হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' [(আইঃ)-এর ভাষণ]

"মজলিসে শূরায় কতিপয় প্রস্তাব এ উদ্দেশ্যেই উপস্থাপন করানো হয়ে থাকে যে, একটি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি না দেবার কারণে মারাত্মক হয়ে থাকতে পারে। এ সমস্যার সমাধান কল্পে জামাত প্রথম থেকে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকতে পারে কিন্তু ওগুলো সুপ্ত হয়ে থাকতে পারে। এজন্যে এসব সমস্যাকে আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার জন্যে আর জামাতের দৃষ্টি এগুলোর প্রতি আকর্ষণ করানোর জন্যে মজলিসে শূরায় এসব সমস্যাদি উপস্থাপন করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে" [রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৩ (ছাপা হয়নি) পৃষ্ঠা ১০৪]।

সূরাতুল আ'রাফ - ৭

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। আর সে তার হাত বের করেছিলো তখন দেখ তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের নিকট ধব্‌ধবে সাদা দেখাতে লাগল।[১০২৪]

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾

১১০। ফেরাউনের জাতির নেতারা বললো, নিশ্চয় এ ব্যক্তি একজন অভিজ্ঞ যাদুকর;[১০২৫]

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١١﴾

১১১। সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ[১০২৬] থেকে বের করে দিতে চায়; এখন তোমরা কী পরামর্শ দাও?'

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١٢﴾

১১২। তারা বললো, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে-বন্দরে সমবেতকারীদেরকে পাঠাও,

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿١١٣﴾

১১৩। তারা প্রত্যেক ঝানু যাদুকরকে যেন তোমার কাছে নিয়ে আসে।'

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪। আর যাদুকররা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হলো, তারা বললো, আমাদের জন্য কি নিশ্চিত কোন পুরস্কার আছে, যদি আমরাই বিজয়ী হই।

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫। সে বললো, 'তাতো বটেই, তদুপরি তোমরা নিশ্চয় আমার প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

১০২৪। এটা সুবিদিত যে, উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আত্মিক উন্নতির প্রকৃতি বা স্তর (মাকাম) অনুযায়ী তাদের দেহ থেকে বিভিন্ন বর্ণের নয়নাভিরাম রশ্মিরেখা বিকীর্ণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার নবীগণের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোক-রেখা বা জ্যোতিঃ উজ্জ্বল সাদা বর্ণের। একইভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর হাত যে রশ্মি বা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করেছিল তা অবশ্যই সেই বর্ণের (অর্থাৎ উজ্জ্বল সাদা) হয়ে থাকবে এবং যখন তা দৃশ্যমান করা হলো তখন স্বভাবতঃ অবলোকনকারীদের চোখে তাঁর হস্তদ্বয় সম্পূর্ণ সাদাবর্ণের দেখাচ্ছিল। অন্যান্য নবীগণের সময়েও এরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বুযূর্গ ছিলেন বলে জানা যায়। আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেন ঃ তোমার হস্ত তোমার নিজ বগলে প্রবেশ করাও। তা শুভ্র নির্মল হয়ে বের হবে (২৮ঃ৩৩)। সাংকেতিক ভাষায় মূসা (আঃ)-এর প্রতি এটা এই স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করেছিল যে, যদি তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রাখেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত রাখেন, তবে তারা নিজেরাই কেবল আলোকিত হবে না, অধিকন্তু অন্যের জন্যেও তারা আলো বিকীরণ করবে। নচেৎ তারা শুধু অন্ধকারাচ্ছন্নই হবে না, বরং নৈতিকভাবে ব্যাধিগ্রস্তও হবে। অতএব ঐ বিস্ময়কর ঘটনাটি যাদুকরের যাদুমন্ত্র ছিল না, পরন্তু আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ এক নিদর্শন ছিল।

১০২৫। "সাহেরুন" কেবলমাত্র ভেল্‌কীবাজকেই বুঝায় না। এর আরো অর্থ হয়, যথা- মায়াবী, বুদ্ধিমান, এমন কৌশলওয়ালা ব্যক্তি যে কোন বিষয়কে তার প্রকৃত অবস্থার বিপরীত দেখাতে পারে, প্রতারক, ভ্রান্তপথে চালনাকারী অথবা ভুলাবার জন্য বিষয়ান্তরে মনোযোগ আকর্ষণকারী ইত্যাদি (লেইন)। ১২৮ আয়াতও দেখুন।

১০২৬। এই কথাগুলির উদ্দেশ্য হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মিশনারীদের মনোভাবকে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত করে তোলা। অথচ, সত্য এটাই ছিল তাদেরকে বহিষ্কার করে দেয়ার কোন ইচ্ছাই মূসা (আঃ)-এর ছিল না। নিজ অনুসারীদেরকে মিশন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

হাদীস শরীফ

কথা বলার পদ্ধতি

কুরআন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٩﴾

অনুবাদ - সে যে কথাই বলুক না কেন, তার নিকট অবশ্যই একজন অতন্দ্র প্রহরী রয়েছে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৯)

হাদীস ঃ

'ওয়া আন আবী হুরায়রাতা আনান্নাবীয়্যা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ক্বালা কাফা বিল মারয়ে কাযেবান আই ইউহাদ্দেসা বেকুল্লে মা সামেআ' অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, নবী (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হবার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা বলে বেড়ায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

পবিত্র কুরআন আমাদের সতর্ক করেছে যে, তোমরা এমন খোদার বান্দা যিনি সর্বদ্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি আমাদের প্রতিটি কর্ম ও কথা সম্বন্ধে জ্ঞাত। আল্লাহ্ বলেন, আমাদের মুখ হতে যা উচ্চারিত হয় তা সংরক্ষণে সদা প্রস্তুত একজন পর্যবেক্ষক আছেন।

এ হ'তে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের কথা বলার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। কোন এমন কথা আমাদের মুখ হতে যেন বের না হয় যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।

আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) আমাদের সতর্ক করছেন যে, কারো মিথ্যাবাদী হবার জন্য এতটুকু যথেষ্ট, যা সে শুনে তা সে বলে বেড়ায়। এ হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল সতর্ক করছেন যে, মুখের ব্যবহারে অর্থাৎ কথা বলার ব্যাপারে যেন আমরা সংযমী হই। নতুবা কথা বলতে বলতে মিথ্যা, যা সবচেয়ে বড় পাপ তা করে বসব।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা কথা-বার্তার ব্যাপারে সতর্ক নই। যেখান থেকে যা-ই শুনি না কেন তা বলে বেড়াতে শুরু করি। যাচাই করতে চাই না। বরং অপরের সামনে নিজেকে সবজান্তা হিসেবে প্রচার করাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠে। এর ফলে বহু সমস্যা, ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, মামলা-মোকদ্দমা এমনকি খুন পর্যন্ত হয়ে যায়। আর যে এমনভাবে কথা বলে, সে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী চিহ্নিত হয়ে যায়।

সুতরাং ইসলাম কথা বলার আদব আমাদের শিখায় যা শিখলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। আজকের জগতে সত্য, ভালো কথা বলার লোকেরও অভাব। তাই আসুন আমরা এব্যাপারে দুনিয়ার সামনে আদর্শ হই। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার উপর আমল করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

সংগ্রহ ও অনুবাদ - **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

দেখ! মানুষকে আল্লাহ্‌তাআলা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। কথাটি বলা সহজ এবং খুবই সহজ। এবং একে বাহ্যতঃ একটি অতি সাধারণ বিষয় মনে করা হয়। কিন্তু ইহা একটি মৌলিক সত্য ও রহস্য যে, এক বিন্দু পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয় এবং এরূপ শক্তি তার মধ্যে রেখে দেয়া হয়। এর অবস্থান ও মূলে পৌছাবার সামর্থ্য কোন কলা-কৌশলের আছে কি? প্রকৃতিবাদী ও দার্শনিকগণ অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এর মূল আবিষ্কার করতে পারে নি। অনুরূপভাবে প্রতিটি অনু-পরমাণু খোদাতাআলার অধীন। খোদাতাআলা এ বিষয়ে ক্ষমতাবান যে, এই প্রকাশ্য শৃঙ্খলাও এরূপভাবে কায়েম থাকবে এবং এক অলৌকিক বিষয়ও প্রকাশিত হবে। জ্ঞানীগণ এ সুন্দর ব্যবস্থাপনা দেখে বিমুগ্ধ হচ্ছেন। কতক লোক অতি সামান্য ও মামুলী বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে সন্দেহে নিপতিত হন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইব্রাহীম (আঃ)-কে পুড়ে ফেলতে পারে নি, এটাও চন্দ্র-দ্বিখন্ডিত হবার অনুরূপ ধারণা, 'আগুনের দাহিকা শক্তি কতটুকু এবং কোন অবস্থায় এসে তা নিভে যায়, খোদা তা ভাল জানেন- এরূপ যুক্তি বা অনুসিদ্ধান্ত যদি প্রকাশিত হয়, অথবা বলে দেয়া হয়, তাহলে এক্ষুণি তা মেনে নেব।'

কিন্তু এহেন অবস্থায় অদৃশ্যে বিশ্বাস ও সুধারণার আনন্দ ও সৌন্দর্যের কি প্রকাশ ঘটবে? আমি একথা বলি নি যে, খোদা উপকরণ সৃষ্টি করেন না। কিন্তু কতক উপকরণ দৃশ্যমান আর কতক দৃশ্যমান নয়। সার কথা হলো- খোদার ক্রিয়াবলী নানাবিধ। খোদাতাআলার শক্তি কখনো অকেজো হয় না। এবং এর গতিরোধও হয় না। তিনি সৃষ্টির সবকিছু জানেন। "তবে কি আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি" (৫০ঃ১৬)। এ হলো তাঁর শান বা মর্যাদা। যত বড় জ্ঞান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি হোক না কেন কেউ তাঁর কার্যাবলীর অনুমান করতে সমর্থ হবে না। বরং তাকে তার অপারগতা প্রকাশ করতে হবে।

একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। ডাক্তার ভাল করে জানেন। আবদুল করীম নামের এক ব্যক্তি আমার নিকট এসেছিল। তার পেটে একটি টিউমার বৃদ্ধি পেয়ে গুহ্যদ্বারের দিকে যাচ্ছিলো। এর কোন চিকিৎসা নেই বলে ডাক্তারগণ তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এমন কতক রোগ আছে যার সঠিক পরিচয় ডাক্তারদের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। যেমন প্লেগ ও কলেরা রোগ। ডাক্তারকে যদি প্লেগের রোগীর ডিউটিতে নিয়োগ করা হয় তাহলে সে অবস্থায় তার নিজেরই দাস্ত হতে থাকবে। সাধ্যানুযায়ী মানুষ জ্ঞান চর্চা করে এবং দর্শনের তত্ত্ব অনুসন্ধানে মগ্ন হয়ে থাকে কিন্তু পরিণামে বুঝতে পারবে যে, সে কিছুই করতে পারে নি। হাদীসে বর্ণিত আছে- সমুদ্রের তীরে যেয়ে যেরূপ একটি পাখি ঠোঁট দিয়ে মুখে পানি তুলে নেয়- ঠিক সেই অনুপাতেই খোদাতাআলার বাণী এবং তাঁর কর্মের তত্ত্ব ও রহস্যের অংশ লাভ হয়। তাহলে দুর্বল মানুষ কি (লাভ করবে)? হ্যাঁ, অর্বাচীন দর্শন এতটুকু যোগ্যতা ও গর্বের কারণে খোদাতাআলার এক ক্রিয়া, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে এবং একে প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ বলে মনে করে।

আপত্তি করার সময় দু'টি বিষয় দৃষ্টিপটে রাখবে

আমি একথা বলছি না যে, আপত্তি করবে না। 'না' করবে, অবশ্যি করবে, স্ফূর্তির সাথে এবং প্রাণ খুলে করবে। কিন্তু দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে ঃ প্রথমটি হলো- খোদা-ভীতি (এবং তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা) আর দ্বিতীয়টি (মানুষের অকিঞ্চিতকর ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান)। বড় বড় দার্শনিকগণও পরিশেষে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "আমরা অজ্ঞ"। সীমাহীন অজ্ঞতার মধ্যেই সর্বদা সীমাহীন জ্ঞানের অবস্থান।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন যে, শিরা-উপশিরার সবগুলোকে ওরা জানেন ও বুঝেন কিনা; না হয়- আলোর প্রকৃতি ও এর অবয়ব সম্বন্ধে তো বল যে, তা কী? 'শব্দ' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, কালের পরদার মধ্যে এরূপ হয়ে থাকে এবং ওরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে কণামাত্রও বলতে পারবে না। আগুনের উত্তাপ ও পানির শীতলতা সম্বন্ধে কোন উত্তরই দিতে সক্ষম হবে না। প্রকৃতির সীমার কাছে পৌছানো ডাক্তার ও দার্শনিকদের কাজ নয়। দেখুন আমাদের আকৃতি আয়নাতে প্রতিফলিত হয় কিন্তু আমাদের মাথা ভেঙ্গে গিয়ে আয়নার ভিতরে চলে যায় না। আমরাও নিরাপদ থাকি এবং আয়নার ভেতরে আমাদের চেহারাও দেখা যায়।

অতএব স্মরণ রেখো- আল্লাহ্‌ ভাল জানেন যে, এরূপ হওয়াটা সম্ভব যে, চন্দ্র দিখন্ডিত হোক এবং দ্বিখন্ডিত হওয়ার পরেও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় কোন বিঘ্ন না ঘটে। আসল কথা এটা হলো বস্তুর গুণাগুণ। কার সাধ্য আছে (এ বিষয়) কিছু বলবে? অতএব খোদাতাআলার বিষয় ও অলৌকিকতাকে অস্বীকার করাও অস্বীকারে ত্বরা করা অস্থির মতিত্ব ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। (চলবে)

অনুবাদ - **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

আল্লাহ্‌তাআলার 'আযীয' সিফতের আরো ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৫ মার্চ, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহার পর সূরাতু ইব্রাহীমের ৫নং আয়াত পাঠ করে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেছেন।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

'এবং আমরা প্রত্যেক রসূলকেই তার জাতির ভাষায় ওহী (করে) পাঠিয়েছি, এজন্য যেন সে তাদের নিকট (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে চান পথ-ভ্রষ্ট হতে দেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে সকল নবীগণের এবং আকাশের সকল অধিবাসীদের উপর তাদের চেয়ে বড় সম্মানিত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সকলে জিজ্ঞেস করেছেন, আকাশের অধিবাসীদের উপর কীভাবে সম্মানিত করেছেন? হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা আকাশের অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, **মাঁইয়াকুল মিনহুম ইন্নি ইলাহুম মিন দুনিহি ফাযালিকা নাজ্‌যিহি জাহান্নাম** (সূরাতুল আম্বিয়া ঃ ৩০)।

অর্থ ঃ তাদের মধ্যে যে কেউ বলবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আমিই মা'বূদ তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তি দিব। এভাবেই আমরা জালেমদের শাস্তি দিয়ে থাকি। অথচ আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, সূরাতুল ফাতাহ্ ২-৩ আয়াতে বলছেন, "আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি যেন আল্লাহ্‌তাআলা তোমাকে তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করেন যা তোমার প্রতি আরোপ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে।

তারপর মানুষ জিজ্ঞেস করেছে, সকল নবীর উপর তাঁর (সঃ) অধিকতর সম্মান কীভাবে প্রমাণ হয়? হযরত ইবনে আব্বাস (সঃ) উত্তর দিয়েছেন, আল্লাহ্ অন্য রসূলগণ সম্পর্কে বলেছেন, আমরা প্রত্যেক রসূলকে তার নিজ এলাকার ভাষায় ওহী করে পাঠিয়েছি যেন তিনি তাদেরকে সুস্পষ্ট করে বুঝাতে পারেন (সূরাতু ইব্রাহীম ঃ ৫)।

অথচ আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্ বলেছেন, আমরা তোমাকে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য রসূল করে পাঠিয়েছি (সূরা সাবা ঃ ২৯)।

অতএব হুযূর (সঃ) সমস্ত পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের জন্য রসূল হয়ে এসেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, **লেইউবাইয়্যেনাহুম** হতে জানা যায় যে, রসূল (সঃ)-এর ধর্মীয় শিক্ষাকে অনেক ভাষায় শেখা প্রয়োজন যেন বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর মানুষকে তা শিক্ষা দেয়া যায়।" যেহেতু সমস্ত দেশের মানুষকে ইসলাম শেখাতে হবে তাই অনেক ভাষা শেখা প্রয়োজন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ আপত্তি করে যে, কুরআন শরীফে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ওহী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, **ওয়ামা আর্‌সালনা মিন রসূলীন ইল্লা বিলিসানি ক্বওমিহী** (ইব্রাহীম ঃ ৫) অতএব তোমার প্রতি কেবল আরবী ভাষায় কেন ইলহাম হয়?"

প্রথম উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস কর যে, কেন হয়? তারপরের জবাব এই যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসারী ও অনুগত হবার কারণে আরবীতে ইলহাম হয়।

"আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে আমাদের সম্পর্কের কারণে এমন হয়। আমরা তাঁর অনুগত, অনুসারী। আঁ হযরত (সঃ) আরবী ছিলেন। আমাদের সমস্ত কর্মকান্ড আমাদের জন্য নয় আঁ হযরত (সঃ)-এর জন্য। এবং আল্লাহ্‌র জন্য। আরবীতে ইলহাম না হলে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে সম্পর্ক থাকে না। আল্লাহ্ ইলহামকে মর্যাদাবান করার জন্য আরবীতে ইলহাম করেন। তাছাড়া তিনি ইসলাম ধর্মকে অপরিবর্তনীয় রাখতে চান, হেফাযত করতে চান। যে কথাকে আমরা সুস্বাদু মনে করি সেটাতেই তারা আপত্তি করে। আল্লাহ্ আসল শরীয়ত ও আসল ইমামের ভাষাকে পরিত্যাগ করেন না। তাছাড়া এ সমস্ত কার্যক্রম যেহেতু তাঁরই জন্য অতএব তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কীভাবে করা যায়। তাছাড়া অনেক সময় , ইংরেজী, উর্দূ এবং ফার্সীতেও ইলহাম হয়েছে, যেন আল্লাহ্‌তাআলা প্রমাণ করেন যে, সকল ভাষাই শুনেন। একবার আঁ হযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছিল অন্য ভাষায় কেন ইলহাম হয় না? আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্ ফার্সী ভাষায় ইলহাম করেছিলেন, "ইঁ মুস্‌তে খাকরা গার না বখ্‌শেদ চে কুনেম" অর্থাৎ যদি (মানুষকে) এক মুটি মাটিকে ক্ষমা না করি তো কি করব"

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ ঃ যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাদের অবস্থা অতি মন্দ, বস্তুত সর্বোচ্চ গুণসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য, এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

(সূরাতুন্ নাহল ঃ ৬১)

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٢١٨
الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝٢١٩
وَ تَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ۝٢٢٠
اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٢٢١

অর্থ ঃ এবং তুমি মহাপরাক্রমশালী। বার বার কৃপাকারীর ওপর নির্ভর করো,

যিনি তোমাকে তখনও দেখেন যখন তুমি (একা নামাযে) দাঁড়াও,

এবং তখনও দেখেন যখন তুমি সিজদাকারীদের মধ্যে ঘোরাফেরা করো।

নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরাতুশ্ শোআরা ঃ ২১৮-২২১)।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ
مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٩
يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١٠

অর্থ ঃ অতঃপর যখন সে সেই আগুনের নিকট আসলো, তখন তাকে ডেকে বলা হলো, 'বরকতমন্ডিত করা হয়েছে তাকে যে আগুনের মধ্যে আছে আর তাদেরকেও যার উহার চারদিকে আছে এবং বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্ অ[illegible] পবিত্র।

হে মূসা! প্রকৃত কথা এই যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময় (সূরাতুন্ নামল ঃ ৯-১০)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্তাআলার উপর ভরসা কর। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। ঐ খোদা তোমাকে দেখেন যখন তুমি দোয়া ও নামাযের জন্য দাঁড়াও। ঐ খোদা তোমাকে তখনও দেখেছেন যখন তুমি প্রচ্ছন্ন বী[illegible] আকারে পুণ্যবানদের বংশধারার ম[illegible]মে চলে আসছিলে। অবশেষে তোমার [illegible]ণ্যবান পিতামাতার মাধ্যমে তুমি জন্মগ্র[illegible] করেছ।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ [illegible]ওয়াল (রাঃ) বলেছেন,

"ঐ ব্যক্তি বরকত [illegible]ল্যাণ) প্রাপ্ত হয়েছেন যে আগুনের [illegible]স্থানে এসেছে।" হুযূর (রাঃ) খুব [illegible] তত্ত্বপূর্ণ বাক্য বলেছেন। "সে সে[illegible] পৌঁছে গেল তখন তাকে বকরত[illegible]ত করা হ'ল। যারা তার আ[illegible]শে উপস্থিত ছিল তাদেরকেও। আল্লাহ্ পবিত্র, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। অর্থাৎ হযরত মূসা বাহ্যিকভাবে মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আল্লাহ্ তাকে আধ্যাত্মিক শুভাকাঙ্ক্ষী বানিয়ে দিলেন। তিনি অল্প লোকের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করছিলেন আমরা অনেক মানুষের জন্য মঙ্গলকামী বানিয়ে দিলাম। তিনি বাহ্যিক আলোর জন্য গিয়েছিলেন আমরা অভ্যন্তরীণ আলো দান করলাম। তিনি বাহ্যিকভাবে নিজ লক্ষ্য স্থলের দিকে গিয়েছিলেন আমরা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যস্থলের দিশা দেখিয়ে দিলাম। সুবহানাল্লাহ্। আল্লাহ্ যিনি তাঁর পথের পথিককে মাঝপথে ছেড়ে দেন না। সকল প্রকার শুভ সংবাদ প্রদান করেন।

আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা! আমিই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়- এটিই সত্য কথা। তুমি হাতের লাঠি রেখে দাও। আমি তোমাকে ইয্যত ও বিজয় দান করব।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ
الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝٧٧
وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٧٨
اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْعَلِيْمُ ۝٧٩

অর্থ ঃ নিশ্চয় এ কুরআন [illegible]া ইসরাঈলের সামনে অধিকাংশ এমন [illegible]বষয় বর্ণনা করে যাতে তারা মতভেদ [illegible]রছে।

আর নিশ্চয় এটা [illegible]মিনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত

নিশ্চয় [illegible]মার প্রভু-প্রতিপালক তাঁর আদে[illegible] তাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন আর তি[illegible] মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ (সূরাতুন্ [illegible]মল ঃ ৭৭-৭৯)।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, মানুষের মধ্যে অনেকেই আল্লাহ্র প্রিয় হন। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কারা আল্লাহ্র প্রিয়? হুযূর (সঃ) বললেন, কুরআনকে ধারণ ও বহনকারীরা আল্লাহ্র প্রিয় ও বিশেষ বান্দা হয়ে থাকেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

কুরআন শরীফ এমন উচ্চতর কামালাতে (পূর্ণতা ও শক্তি) পরিপূর্ণ কিতাব যে, এর উজ্জ্বল ও প্রবল কিরণের সামনে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থগুলোর উজ্জ্বলতা লোপ পেয়ে গেছে। কোন মেধাবীর মেধা এমন কোন সত্য উদ্ঘাটন করতে পারবে না যা কুরআনে বর্ণিত হয় নি। কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া কোন আত্মার উপর কেউ ফেলতে পারে না যেমন শক্তিশালী বরকতময় প্রভাব এই গ্রন্থ লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের উপর ফেলতে পারে। এই কিতাব নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তআলার সিফাত-সমূহের জন্য আয়নাস্বরূপ। যার মধ্যে ঐ সব কিছু একজন আল্লাহ্র পথের পথিক পেতে পারে যা কিছু তার প্রয়োজন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসারী হয়ে এর প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়, সে আল্লাহ্তাআলার সিফাত-সমূহের বিকাশস্থল হয়ে যায়। এটি কুরআন শরীফের অসাধারণ কার্যকরী ক্ষমতার ফলে হয়ে থাকে যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এমন প্রচন্ড কার্যক্ষমতা ও বিশেষত্ব অন্য কোন কিতাবে নেই যা অন্যান্য জাতির কাছে ঐশী কিতাব বলে গণ্য হয়েছে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্তাআলা কুরআন শরীফ সম্পর্কে বলেছেন, **হুদাল্লিল মুত্তাকীন** অর্থাৎ কুরআন তাদের জন্য হেদায়াতের কারণ হয় যারা তাকওয়াহ্ অবলম্বন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআনকে যারা দেখে তাদের তাকওয়াহ্ হবে এই যে, তারা একে মূর্খতা, বিদ্বেষ ও কৃপণতার দৃষ্টিতে যেন না দেখে। বরং তাকওয়াহ্র সাথে খাঁটি অন্তকরণ নিয়ে যেন কুরআন পড়ে।"

১৯০৬ইং সনের সালানা জলসার বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন,

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফকে পরিত্যাগ করে সে সবকিছু পরিত্যাগ করে। কুরআনে সমস্ত কথা লেখা আছে। প্রথম ও শেষ যুগের মানুষের কথা আছে। ঐশী তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং ঠিক মধ্যস্থলে চারিদিকে সমতা ও সামঞ্জস্য রেখেছে। মানবীয় চরিত্র বা প্রকৃতির প্রত্যেক দিকের প্রত্যেক ধরনের মহৌষধ এখানে বর্ণিত আছে।"

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢٧

অর্থ ঃ অতএব লূত তার প্রতি ঈমান আনলো। আর (ইব্রাহীম) বল্লো, আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে হিজরত করবো, নিশ্চয়

তিনি মহা পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময় (সূরাতুল আনকাবূত ঃ ২৭)

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! মুহাজির কে? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি মুহাজির যে ঐ সমস্ত কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে যা করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন।"

হযরত সায্‌রা বিন আবূ ফাকিহা বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরতকে বলতে শুনেছি, শয়তান মানব সন্তানকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেক রাস্তায় বসে থাকে। সে মানুষের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে বসেছে। সে মানুষকে বলে, তুমি কি বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করবে? মানুষ শয়তানকে অস্বীকার করে, ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর সে মুসলমানের হিজরতের রাস্তায় বসে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি নিজের জমি, আকাশ, ছেড়ে চলে যাবে? মুহাজিরের উপমা এমন ঘোড়ার সাথে দেয়া যায়, যে অনেক লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সুতরাং শয়তানের কথা শোনে নি এবং হিজরত করেছে। তারপর মানুষের জেহাদের রাস্তায় বসেছে। জিজ্ঞেস করেছে, তুমি জেহাদ করবে? জেহাদ তো, জান ও মাল ধ্বংসের নাম। যদি যুদ্ধে নাম তবে তুমি মারা যাবে। তোমার স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহিত হবে। তোমার মাল ভাগাভাগি করে নেয়া হবে। তারপরও মানুষ শয়তানের কথা শোনে নি এবং জেহাদ করেছে। তারপর আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ সব কিছু করেছে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত ফরয করে রেখেছেন। আর যে এ পথে মারা গেছে তার জন্যও জান্নাত ফরয করেছেন।"

এটিও শাহদতের একটি শ্রেণী যে, কোন মানুষ যদি পানিতে ডুবে মারা যায় তবে সে শহীদ হয় এবং জান্নাত লাভ করে। কোন ব্যক্তির যানবাহন পশু যদি তাকে ফেলে দিয়ে পায়ের তলে পিষ্ট করে মারে তবুও সে শহীদ হয় এবং তার জন্য জান্নাত ফরয করেছেন। আজকাল খুব কম এমন ঘটনা ঘটে। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে, ট্রাকটার চালক ট্রাকটারের নীচে পড়ে গিয়ে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। তারজন্য ও শুভ সংবাদ যে, সে-ও আল্লাহ্‌র পক্ষে এক ধরনের শহীদ বলে গণ্য হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র খাতিরে মু'মিনকে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। অনেক সময় নিজ ধর্ম-বিশ্বাস এবং রীতি-নীতিকে কখনও বাসস্থানকে কখনও খাদ্যদ্রব্যকে কখনও আত্মীয়-স্বজনকে কখনও জন্মভূমিকে ত্যাগ করে যেতে হয়। মোট কথা যা কিছু ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় অগ্রসর হবার পথে যা কিছু বাধা সৃষ্টি করে সবই পরিত্যাগ করতে হয়।" হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) উপরোক্ত সব কিছুই ছেড়ে এসেছিলেন।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

অর্থ ঃ যাকে তারা আল্লাহ্ ছাড়া ডাকে আল্লাহ্ এমন বস্তুকে ভালভাবে জানেন, আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৩)

মুসআব বিন সা'দ বর্ণনা করেছেন, একবার এক আরাবী (গ্রামবাসী) আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, আমাকে কোন দোয়া বলুন যা আমি বার বার পড়তে থাকব। হুযূর (সঃ) বললেন, পড়, **লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু আল্লাহো আকবারো কাবীরা, আলহামদুলিল্লাহে কাছিরা, সুবহানাল্লি রব্বিল আলামীন। লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আযীযিল** হাকীম। অর্থ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য, আল্লাহ্ পবিত্র এবং তিনি বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক। কোন উপায় বা কোন শক্তি নেই আল্লাহ্‌র ফযল ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।" ঐ আরাবী বললেন, এ তো সব আল্লাহ্‌র জন্য, আমার জন্য কী? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, পড়বে, **আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াহ্‌দীনি ওয়ার যুকনি।** হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি কৃপা কর, আমাকে হেদায়াত দাও, আমাকে রিয্‌ক প্রদান কর।"

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٨﴾

অর্থ ঃ আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন। অতঃপর তিনিই এর পুনরাবর্তন করেন। এবং এটা তাঁর জন্যে অতি সহজ বিষয় এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শান-মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় (সূরাতুর রূম ঃ ২৮)।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٠﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় (সূরাতু লুকমান ঃ ৯-১০)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌তাআলা যখন জান্নাত ও দোযখকে সৃষ্টি করলেন তখন সর্ব প্রথম হযরত জিব্রাঈলকে পাঠালেন যে দেখ, আমি জান্নাতকে সৃষ্টি করেছি এবং জান্নাতবাসীদের জন্য যা সৃষ্টি করেছি। হযরত জিব্রাঈল দেখে গিয়ে আল্লাহ্‌কে বললেন, হে খোদা! এ জান্নাত তো এমন যে, যে দেখবে সে এর মধ্যে প্রবেশ করে যাবে। তখন আল্লাহ্‌তাআলা জান্নাতের বাইরে কষ্টের দেয়াল সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ অনেক কষ্টের পরে জান্নাত লাভ করা যাবে। তারপর আল্লাহ্‌তাআলা জিব্রাঈলকে পাঠালেন যে, জাহান্নামকে দেখে আস। হযরত জিব্রাঈল দেখে এসে বললেন, হে মহান আল্লাহ্! এত ভয়ংকর জাহান্নামে কেউ প্রবেশ হওয়া তো দূরের কথা কেউ এর সম্পর্কে শুনতেও চাইবে না। তখন আল্লাহ্ আদেশ করলেন, ফলে জাহান্নামের বাইরে জৈবিক আকর্ষণের দেয়াল সৃষ্টি করে দেয়া হোল। তারপর আল্লাহ্ হযরত জিব্রাঈলকে পাঠালেন, এবার দেখে আস। জিব্রাঈল গিয়ে দেখে এসে বললেন, ইয়া আল্লাহ্ তোমার ইয্‌যতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে, এর মধ্যে প্রবেশ হওয়া থেকে কেউ নিজকে বাঁচাতে পারবে না।"

এগুলো সব রূপক ভাষায় বর্ণনা। আসল কথা পৃথিবীতে ও আকাশসমূহে দোযখ ও জান্নাত বিস্তৃত হয়ে আছে। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না আসল তথ্য কী!

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

অর্থ ঃ এবং পৃথিবীতে যত গাছ-পালা আছে যদি সব কলম হয়, আর যে সাগর রয়েছে, তার সাথে যদি আরও সাত সাগর কালি যুক্ত হয় তথাপি আল্লাহ্ বাণীর শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় (সূরাতু লুকমান ঃ ২৮)।

قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

অর্থ ঃ তুমি বলো, 'তোমরা আমার সামনে তাদেরকে আন যাদেরকে শরীক করে তোমরা তাঁর সাথে মিলাচ্ছো, এটা কখনও হতে পারে না, বরং আল্লাহ্ই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় (সূরা সাবা - ২৮)।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র শরীক (অংশীদার) আছে বলে মনে করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

মুশরিক লোকদের যেভাবে আল্লাহ্ সম্পর্কে জানা উচিত ছিল সেভাবে জানে নি। তারা মনে করেছে, অন্যান্য অংশীদারদের সহায়তা ব্যতীত আল্লাহ্র পক্ষে এত বড় জগৎ পরিচালনা সম্ভব নয়। অথচ আল্লাহ্ একাই সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী। তারপর হুযূর (আইঃ) বললেন, আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আমি খুব দ্রুত পড়ছি। আমি চেষ্টা তো করেছি আস্তে পড়ার। আল্লাহ্ করুন দোভাষীদের জন্য সহজে বোধগম্য হোক। তারপর হুযূর আবার খুতবার বিষয় বর্ণনা করেন।

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ্ মানুষের জন্যে যে কোন কৃপার দুয়ার খুললে তার প্রতিরোধকারী কেউ নেই, আর তিনি (তাকে) প্রতিরোধ করলে তাঁর পরে তা খোলার কেউ নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় (সূরাতুল ফাতির ঃ ৩)।

হযরত জুন্দব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'একজন গ্রামবাসী এসে তার উটকে বসালেন। উটের পা বেঁধে দিলেন। তারপর আঁ হযরত (সঃ)-এর পেছনে নামায পড়লেন। আঁ হযরত (সঃ) নামায শেষ করলেন। ঐ আরাবী বাইরে এসে তার উট খুলে তার উপর চড়ে বসে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ্! আমার ও (হযরত) মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর করুণা বর্ষণ কর এবং তোমার রহমতের অংশীদার আমাদের দু'জন ব্যতীত আর কাউকে কর না।' আঁ হযরত (সঃ) তার কথা শুনে বললেন, তোমরা শুনেছ এই আরাবী কী বলেছে? তোমাদের কি মনে হয় এই আরাবী বেশি বিপথগামী না তার উট? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা শুনেছি। আঁ হযরত (সঃ)-ঐ আরাবীকে বললেন, 'তুমি আল্লাহ্র রহমতকে খুব সীমিত করে ফেলেছ! আল্লাহ্র রহমত তো অনেক বেশি ও ব্যাপক। আল্লাহ্তাআলার রহমতের অনেক বড় ভান্ডার রয়েছে। তার একশ' ভাগের মধ্য থেকে মাত্র একভাগ তিনি পৃথিবীতে নাযেল করেছেন। যার মধ্যে তোমরা সকল মানুষ, পশুপাখী সমস্ত প্রাণীরা পরস্পর একে অপরের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলেছ। অথচ পৃথিবীর এ সমস্ত রহমত মাত্র এক ভাগ। বাকী ৯৯ ভাগ আল্লাহ্ নিজ হাতে রেখেছেন। তোমাদের কি মনে হয় এই ব্যক্তি বেশি বিপথগামী না তার উট?

হযরত যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সুলেহ্ হুদায়বিয়াহ্'র বছর আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে বেরিয়ে ছিলাম। রাস্তায় রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। আঁ হযরত (সঃ) ফজরের নামায পড়ালেন। তারপর হুযূর (সঃ) আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তোমরা জান তোমাদের খোদা কী বলছেন ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) ভাল জানেন। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, "আজ সকালে আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এক অংশ তো আমার প্রতি ঈমানদার হয়েছে আর এক অংশ কাফির হয়েছে। যারা বলেছে যে, আজকের বৃষ্টি আল্লাহ্র ফযল ও অনুদানে হয়েছে তারা ঈমান এনেছে এবং আকাশের নক্ষত্র অস্বীকার করেছে। যে ব্যক্তি বলে যে, অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে অমুক কাজ হয়েছে সে নক্ষত্রের উপর ঈমান রেখেছে।"

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউই নিজ আমল (কর্মফল) দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সাহাবা আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার আমলও না? হুযূর (সঃ) বললেন, আমার আমলও না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্র ফযল ও তাঁর রহমত আমাকে আবৃত করে নিতে পারে।

আল্লাহ্র সিফত 'আযীয' সম্বলিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ইলহাম

"ইন্নি মুইয্যুকা লা মানিয়া লেমা উতি" আমি তোমাকে ইয্যত ও বিজয় প্রদান করব। আমি যা দেব কেউ তা বন্ধ করতে পারবে না। 'ইযালায়ে আওহাম' গ্রন্থে একটি দীর্ঘ আরবী ভাষার ইলহাম আছে যার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ,

"তুমি বল, এ বিষয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে না হয়ে অন্য কারো পক্ষ থেকে যদি হোত তবে তোমরা এর মধ্যে অনেক গরমিল খুঁজে পেতে। তুমি বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের ভুল ধারণার অনুসরণ করতেন তবে ভূপৃষ্ঠে ও আকাশে এবং এতদুভয়ের মাঝে যেসব সৃষ্টি রয়েছে তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। আল্লাহ্র এত প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেত। আল্লাহ্ বড় পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান। তুমি বল, যদি সাগরের সমস্ত পানি লেখার জন্য কালি বানানো হোত তবুও আমার প্রভুর কালাম (বাণী) লেখা হওয়ার পূর্বে সমস্ত কালি শেষ হয়ে যেত। যদি আরো সাগরের পানিও এর সাথে মিশানো হোত তবুও। তুমি বলে দাও, 'তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। আল্লাহ্ অনেক বেশি ক্ষমাশীল ও বারংবার কৃপাকারী।"

১৯৮৩ইং সনের ইলহাম ঃ (আরবী অনুবাদ থেকে) তিনি যে ব্যক্তিকে উন্নীত করতে চান তাকে উন্নীত করেন, যাকে চান নত করে দেন। যাকে চান ইয্যত দান করেন। যাকে চান বেইয্যত করেন। যাকে চাহেন নিজের নৈকট্যপ্রাপ্ত প্রিয় বান্দা করে নেন।"

আমি তো আস্তে আস্তেই পড়েছি। জানি না দোভাষীদের জন্য কেমন হয়েছে। আগামী দিনের জন্য প্রস্তুতি নিবেন।

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(০১-০১-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন নং ১ ঃ সূরাতু ইউসুফ-এর কয়েকটি আয়াত- এতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু আছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা কীভাবে করা উচিত। মিশরের রাজা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যার মধ্যে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি ইঙ্গিত ছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) সেই আসন্ন ঘটনাবলীর কথা রাজাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটার কোন সম্ভবনাই ছিল না। রাজাও পূর্বেই সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে নিলেন যার ফলে মিসরে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন জনগণের বেশি ক্ষয়-ক্ষতি হয় নি। এটাই সূরাতু ইউসুফের শিক্ষার নির্যাস।

প্রশ্ন নং ২ ঃ প্রযুক্তির বৈপ্লবিক উন্নতির ফলে আজকাল টেলিভিশন, সিডি, ভিডিও, সিনেমা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক প্রোগ্রামের ছড়াছড়ি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, লোকদের এর কুফল থেকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। হেরোইনের নেশার মত আসক্ত হয়ে পড়েছে। এথেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এর একটাই পথ আর তা হলো, উপদেশ দিতে থাকা। বিশেষ করে ছেলে-পেলেদের জন্যে ইহা খুবই খারাপ। নিজেরা এথেকে বিরত থেকে তাদের বুঝাতে হবে। উপদেশই এর এক মাত্র সমাধান। ফাযাক্কির ইন্নাফাআতিয্ যিক্‌রা- অর্থাৎ বার বার উপদেশ দিতে থাকো নিশ্চয় উপদেশে কল্যাণ রয়েছে। এ কাজ বার বার করলে দেখবেন ছোটরাও এর কুফল বুঝতে পারবে। ধৈর্য এবং ভালবাসা সহকারে উপদেশ দিলে নিশ্চয়ই ভাল ফল পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ সূরাতুস্ সাজ্‌দাহর ২৪ আয়াতে আছে- আমরা মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম। এখানে 'লিকাইহী' শব্দের 'হী'কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, এটা দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যখন মহানবী (সঃ) মে'রাজে গিয়েছিলেন তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই আয়াতে সেই সাক্ষাতের কথা হয়তো বলা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) মহানবী (সঃ)-কে বার বার জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, আপনি আবার আল্লাহ্‌তাআলার কাছে গিয়ে অনুরোধ করুন মুসলমানদের জন্য দৈনিক পঞ্চাশ বার নামায পড়ার হুকুম যেন পুনর্বার বিবেচনা করে দৈনিক নামাযের সংখ্যা কমান হয় এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তাআলা দৈনিক ফরজ নামাযের সংখ্যা পাঁচটি নির্ধারিত করেছিলেন। এ আয়াতে সেই কাশ্‌ফী সাক্ষাতের কথাই উল্লেখিত হয়েছে।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ "ক্রিসমাস" ও "নিউ ইয়ার" এ ধরনের অনেক রকম উৎসবের মত আমাদের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের বাসায়ও এ রকম পার্টি ও উৎসব করতে চায়। এ প্রবণতা কীভাবে রোধ করা যায়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ 'ক্রিসমাস' ও 'নিউ ইয়ার'-এর অনেক আগেই ছেলে-পেলেদের বুঝাতে হবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। তিনি (সঃ) মারা গেছেন। আমরাও তাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু ক্রিসমাস অনুষ্ঠান কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এটা একটা PAGAN ধরনের অনুষ্ঠান যা পশ্চিমারা নিজেদের ফূর্তির জন্য বানিয়ে নিয়েছে। আমরা এটাকে অর্থহীন মনে করি। নতুন বছরের অনুষ্ঠানও সেই রকমই একটা অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ আমেরিকা থেকে হুস্‌নে আরা বেগমের একটি প্রশ্ন পেশ করা হয় ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইল্‌হাম আছে যার অর্থ ঃ "এককালে লাহোর নামেরও একটা শহর ছিল"। এর ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, এরকম একটা ইল্‌হাম তাঁর উপর হয়েছিল এবং এর দুই ধরনের ব্যাখ্যা সম্ভব। একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, হয়তো কোন দিন এত বড় যুদ্ধ হবে, আণবিক বোমার আঘাতে লাহোর শহর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ পরে ঐতিহাসিকরা লিখতে বাধ্য হবে "এককালে লাহোর নামেরও একটা শহর পৃথিবীর বুকে ছিল।" আর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, কাদিয়ান নামক শহরটা এত বড় হয়ে যাবে যে, লাহোর ও কাদিয়ান শহর একাকার হয়ে যাবে তখন সেই বিরাট বড় শহরটাকে কাদিয়ান শহরই বলা হবে। তখন লাহোর বলে কোন আলাদা শহরই থাকবে না। এটি একটি আশাব্যঞ্জক অর্থ। [এই পর্যায়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি নযম পাঠ করেন জনাব জুবায়ের]

প্রশ্ন নং ৬ ঃ 'বাশার' এবং 'ইন্‌সান' এ দু' শব্দের মধ্যে কোন তফাত আছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ দু'টি শব্দই মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, মানুষকে 'বাশার' নাম এজন্যে দেয়া হয়েছে বাশর বা চেহারা দেখলেই হৃদয়ের ভাব সহজে বুঝা যায়, তার মধ্যে কি আছে আর কি বলছে কি গোপন করছে তা চেহারা দেখলে বুঝা যায়। আবার মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ই ইনসান শব্দের সম্পর্কে বলেছেন, এর মূল শব্দ আরবীতে 'ইন্‌স' ভালোবাসা এবং ইনসান অর্থ দু'টি ভালবাসা একটি মানুষের জন্য ভালবাসা ও দ্বিতীয়টি আল্লাহ্‌তাআলার জন্য ভালবাসা। প্রকৃত মানুষের মনের ভিতরে ঐ দু'টি ভালবাসাই সব সময় থাকবে।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ চট্টগ্রাম হতে জনাব মনসুর সাহেব এ প্রশ্ন প্রেরণ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপর ইল্‌হাম হয়েছিল, "তুমি সেই বুযূর্গ মসীহ্ যার সময় নষ্ট হতে দেয়া যাবে না"। দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা এভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি গভীর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন যে, তার কোন সময় নষ্ট করা হবে না। আমি নিজেও আশ্চর্য হই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এতগুলো কাজ করলেন কীভাবে! তিনি একটি সেকেন্ডও সময় নষ্ট করেন নি। তিনি একেবারে একা ছিলেন। তাঁর চারিপাশে শত্রু বা বিরুদ্ধবাদীরা তাকে ঘিরে রাখতো। তাঁর উপর মামলা-মোকদ্দমা লেগে থাকতো। তাঁকে জরুরী কাজে প্রায়ই নানা জায়গায় ছয় ছয় মাস ভ্রমণ করতেও হ'ত। এরই ভিতরেই তাঁর বই লেখার কাজ চলতো। বহু চিঠি লিখতে হত। আবার তিনি মুসলমান, হিন্দু ও খৃষ্টানদের সঙ্গে "মুনাযেরা" অর্থাৎ বিতর্ক অনুষ্ঠানসমূহেও

অংশগ্রহণ করতেন। আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং তাঁর এ অসাধারণ কার্যাবলীর জন্য তাঁর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ একটি ছোট মেয়ে জানতে চায় ঃ 'হুযূর নতুন বৎসরের জন্য আপনার বার্তা কী?'

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া করে নতুন বৎসর শুরু করতে হবে। আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। সময় তো প্রবহমান। এটা কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। মানুষ এটাকে নিজের ইচ্ছামত ভাগ করবার চেষ্টা করে থাকে এবং একটি দিনকে নতুন বছরের প্রথম দিন বলে আখ্যা দেয়। আমাদের কিন্তু ঐসব ফ্যাশনের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়। দোয়া করে সবার জন্য শুভেচ্ছা প্রকাশ করে নিজের কাজে মনোনিবেশ করা উচিত। এটাই আমার নতুন বছরের বার্তা।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ ABORIGINES অর্থাৎ প্রাচীনতম জাতিসমূহের কোন সদস্য কি আহমদী হয়েছিল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আমেরিকাতে রেড্ ইন্ডিয়ান জাতির দুই একজন আহমদী হয়েছিল কিন্তু পরে তারা জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে নি মানে নিজেদের গোত্রে ফিরে গিয়েছিল। এর কারণ হ'ল আমরিকার নীতি হ'ল ABORIGINES দেরকে মদ ও অন্যান্য বদ-অভ্যাসে নিমজ্জিত রাখা। এ নীতির ফল হচ্ছে, যদি তারা আহমদী হয়ও তারা বেশি দিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে পারে না। অস্ট্রেলিয়াতে ABORIGINES আছে এবং তাদের মধ্যে যারা আহমদী হয়েছেন তারা আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ভাল আহমদী হিসাবে এখনও টিকে আছেন।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ আল্লাহ্‌তাআলার ৯৯টি গুণবাচক নাম আছে। কালের পরিবর্তনে এগুলো বাড়ছে। এ বিষয়ে দয়া করে কিছু বলুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলার ৯৯টি গুণবাচক নাম মানুষের বুঝার ক্ষমতা অনুসারে বলা হয়েছে। সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এ বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার আরও সৃষ্টি থাকতে পারে। তাদের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার অন্যান্য গুণ প্রকাশ পাবে। নতুন নতুন পদার্থের বা ধাতুর আবিষ্কারের ফলে আল্লাহ্‌তাআলার নতুন নতুন গুণাবলী প্রকাশ পাচ্ছে। নতুবা আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য অসংখ্য যা গুণে শেষ করা যায় না।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ 'লা তাশতারু বি আয়াতিল্লাহ্ সামানা কালীলান' (আমার আয়াত তুচ্ছমূল্যে বিক্রী করো না)-এর দ্বারা কী বুঝায়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটাতে মোল্লাদের বদ-অভ্যাসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইহুদীরাও ঐ কাজ করতো অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেরিত কিতাবসমূহের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে জনগণকে প্রতারিত করতো এবং এটা তাদের উপার্জনের একটা পন্থা। এটা ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে সেই বদ-অভ্যাস যেন পরিত্যাগ করা হয়। আল্লাহ্‌র আয়াতকে পার্থিব হীন স্বার্থে যেন ব্যবহার করা না হয়।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার কোনটি ছুটে গেলে সেই রোযা আবার অন্য সময় রাখা যাবে কিনা ?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, শাওয়াল মাসের রোযা ফরয নয়। তাই যদি ঐ রোযা কোন কারণে ছুটে যায় অর্থাৎ রাখা সম্ভব না হয় তো পরে আবার সেই রোযা রাখার দরকার নেই।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ যেসব শিশু খুব অল্প বয়সে মারা যায় তারা কি আল্লাহ্‌তাআলার কাছে থেকে বড় হতে থাকে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ একটি হাদীসে আছে যে, ঐ সব শিশুগণের আত্মা পরকালে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং তারা বড় হতে যাকে এবং পূর্ণ আত্মাতে রূপান্তরিত হবে।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ অনেকে ফজরের নামাযের পরে দু'রাকাত সুন্নত নামায পড়েন,এর তাৎপর্য কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ ফজরের সুন্নত নামায ফরয এর পূর্বে পড়াই ভাল। এটা রসূলে করীম (সঃ)-এর সুন্নত। ঘরে পড়লেও এ সুন্নত ফরযের আগে পড়বেন।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একবার বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যুর পরে তোমাদের জীবন লাভ হবে" এটা কি আধ্যাত্মিকভাবে না বৈষায়িকভাবে করার কথা বলেছেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সুফীগণ এ কথা বলে থাকেন **মুতূ কাবলা আনতা মুতূ**- তোমরা মরার আগে মরো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সুফীগণের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে এক ব্যক্তি যখন পার্থিব জীবনের লোভ লালসা পরিত্যাগ করে তার পরই সে প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্‌তাআলাকে খুশী করবার জন্য মানুষ যখন সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় তখন সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আনন্দপূর্ণ জীবন লাভ করে। এটাই এ কথার সত্যিকার অর্থ।

সংকলন ও অনুবাদ-**নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী**

সন্তান লাভ

নিউজিল্যান্ড প্রবাসী জনাব শোয়েব আহমদ ও তার স্ত্রী মিসেস জিনাত সুলতানা গত ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখে নিউজিল্যান্ড সময় সকাল ১০.০০ ঘটিকায় একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। নবজাতকের নাম রাখা হয় উমায়ের আহমেদ। নবজাতকের দাদা ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী জনাব শরীফ আহমদ। তিনি বর্তমানে নিউজিল্যান্ড প্রবাসী। তার নানা রংপুরের অধিবাসী খাকসার মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান।

নবজাতক যাতে সুস্থ, মেধাবী ও ধর্মের সেবক হতে পারে সে জন্য জামাতের সকল ভাই-বোনের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

- **মোঃ জাহিদুর রহমান**, ইন্টারনাল অডিটর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেরগাতীর প্রবীণ আহমদী সদস্যা মোছাঃ আরজুদা খাতুন ১২ই মার্চ, ২০০২ রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৪.৪৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র, পুত্র বধু ৫ নাতী-নাতনী রেখে যান। মরহুমার রূহের মাগফেরাতের জন্য জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নীর কাছে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

♦ তেরগাতী জামাতের প্রবীণ আহমদী সদস্যা মোছাঃ আমেনা খাতুন, ৫/২/২০০২ রোজ মঙ্গলবার বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। পরিবারে তিনি একাই আহমদী ছিলেন। আহমদীয়তের কারণে তাঁর ছেলে ও আত্মীয়-স্বজন জানাযায় শরীক হয় নি। মরহুমার রূহের মাগফেরাতের জন্য জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নীর কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

প্রেসিডেন্ট, তেরগাতী

খিলাফত সম্বন্ধে শীয়া ও সুন্নী দৃষ্টিভঙ্গী

খিলাফত নবুওয়তের পরিশিষ্ট। খলীফারা নবুওয়তের মিশনকে পরিচালনা করে থাকেন। নবুওয়তের বরকতকে পরবর্তীদের মধ্যে প্রবহমান রাখেন। নবীর সুন্নত তরুতাজা থাকে খিলাফতের মাধ্যমে।

মহানবী (সঃ) বলেছিলেন, 'আমার পর ত্রিশ বৎসর কাল খিলাফত চালু থাকবে। এরপরে রাজতন্ত্র চালু হবে। এর পর অত্যাচারী শাসকরা আসবে, অতঃপর আবার নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, (বিভিন্ন হাদীস দ্রষ্টব্য)।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। মহাবনীর (সঃ) ইন্তেকালের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে। এই খিলাফত প্রায় ত্রিশ বৎসর চালু থাকার পর ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে আলীর (রাঃ) শাহাদতের পর বিনষ্ট হয়ে যায়। খলীফা টাইটেল বহাল রেখে আমীর মাবিয়া রাজা হন। সা'দবিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) আমীর মাবিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে বলেছিলেন, আস্‌সালামু আলায়কুম আইউহাল মালেক। মাবিয়া বললেন, আপনি আমীরুল মু'মিনীন বলে আমাকে মালেক বা রাজা বললেন কেন? উত্তরে সা'দ বললেন, খোদার কসম, যেভাবে আপনি এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন অনুরূপভাবে যদি আমাকে এই ক্ষমতা দান করা হত তাহলে আমি তা কখনই গ্রহণ করতাম না (ইবনে আসির, জিলদ ৩, পৃঃ ৪০৫)। আমীর মাবিয়া নিজেও বলতেন, 'আনা আওয়ালুল মুলুক।' আমি ইসলামে প্রথম রাজা। এই রাজত্ব ধারা চলতে থাকে এজিদের মধ্য দিয়ে উমাইয়াদের মধ্যে এবং পরে আব্বাসীদের মধ্যে। এর পর শুরু হয় বিচ্ছিন্ন শাসন। পৃথিবী থেকে প্রকৃত খিলাফত বিদায় নেয় দীর্ঘকালের জন্য। আবূ বকর (রাঃ) থেকে আলী (রাঃ) পর্যন্ত চার খলীফাই প্রকৃত খলীফা। এর পর যারা খলীফা খেতাব ব্যবহার করেছে তারা খলীফা নয় রাজা। প্রতি শতাব্দীর প্রারম্ভে যেসব মোজাদ্দিদ এসেছেন তাঁরা সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্য ছিলেন না। ভারতে আগত মোজাদ্দিদ আফ্রিকায় সংস্কার কাজ করতে পারেন নি, আবার আফ্রিকায় আগত মোজাদ্দিদও নিজ এলাকার বাইরে সংস্কার কাজ করতে পারেন নি। মোজাদ্দিদের এই ধারার মধ্যে উমর ইবনে আব্দুল আযীযই (রহঃ) প্রথম।

শীয়ারা বলে, মহানবীর (সঃ) পর আলীই (রাঃ) বৈধ ইমাম। তারা ইমামত এবং খিলাফতকে ভিন্ন মনে করে। তারা বলে, খিলাফত হ'ল জাগতিক শাসনের নাম আর ইমামত হল আধ্যাত্মিক। তারা বলে, আবূ বকর, উমর এবং উসমান চক্রান্ত করে নেতৃত্ব দখল করে নেন। তারা খলীফা (জাগতিক) হয়েছিলেন বটে তবে তারা ইমাম বা আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন না। আধ্যাত্মিক নেতা হলেন মৌলা আলী। কারণ গাদিরে খোমে মহানবী (সঃ) তাঁকে ইমাম নিযুক্ত করে যান। এ ব্যাপারে শীয়ারা বহু হাদীসও পেশ করে থাকে। ওরা উমরকে (রাঃ) সকল চক্রান্তের হোতা মনে করে। এজন্য তারা উমরের মৃত্যু দিনে 'ঈদে উমার' আনন্দ উৎসব পালন করে।

গাদিরে খোমের এই বর্ণনা সঠিক নয়। রসূল করীম (সঃ) বলেছিলেন, 'আমি আবূ বকরকে আমার পর নিযুক্ত করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পরে আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, এটা খোদার কাজ। খোদা কখনও আবূ বকর ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা করবেন না, আর মু'মিনদের জামাতও খোদার ইচ্ছায় আবূ বকর ব্যতীত অন্য কারো খিলাফতে সন্তুষ্ট হবে না (বুখারী)। শীয়ারা আলীকে (রাঃ) নিয়ে লাফালাফি করে অথচ আলী (রাঃ) স্বয়ং প্রথম তিন খলীফাকে মেনে আনুগত্য করে গেছেন। তিনি খলীফা হওয়ার পরও পূর্ববর্তী তিন খলীফা সম্বন্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেন নি। তিনি প্রথম তিন খলীফাকে 'রাশেদীন ও 'মাহদীঈন' জ্ঞান করতেন। একেই বলে বাদী নীরব আর সাক্ষী সরব।

শীয়াদের মতে মৌলা আলীই প্রথম ইমাম এবং জাগতিক শাসক হিসাবে খলীফা। এরপর ইমাম হলেন হাসান এবং হুসেন (রাঃ)। এরপর এই বংশে এই ধারা চালু হয়েছে জয়নুল আবেদীন, জাফর সাদেক, বাকের রহমতুল্লাহে আলায়হে (সঃ) প্রমুখের মাধ্যমে বারজন বা সাতজন পর্যন্ত। এদেরকে ইসনা আশারীয়া এবং সাবইয়া ইমামিয়া বলা হয়। ইসনা আশারীয়ারা দ্বাদশ ইমামকে ইমাম গায়েব, ইমাম কায়েম, ইমাম মুন্তাজেররূপে মান্য করে। তাদের মতে দ্বাদশ ইমাম মোহাম্মদই ইমাম মাহদী । সাবইয়ারা তা মানে না। তারা হাজের ইমামে বিশ্বাসী।

প্রকৃত সুন্নী আহমদী জামাতের মতে খলীফা তিন প্রকার। প্রথম প্রকার খলীফা হলেন খলীফাতুল্লাহ বা নবী। দ্বিতীয় প্রকার খলীফা হলেন নবীর খলীফা আর তৃতীয় প্রকার খিলাফত হলো জাতিগত খিলাফত। যেমন পূর্ববর্তী জাতির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে মুসলমানরা। বলা হয়েছে, **হুওয়াল্লাযী জাআলাকুম খালায়েফা ফিল আরয** (সূরা ফাতের ঃ ৪০ আয়াত)।

আল্লাহ্‌তাআলা সূরা নূরের আয়াতে ইস্তেখলাফ ও মহানবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহে মাওউদ (অঃ)-এর মাধ্যমে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইমাম মাহ্‌দী একাধারে খলীফাতুল্লাহ্ এবং একাধারে মহানবীর (সঃ) খলীফা। এটি খিলাফতের দ্বিতীয় পর্যায়। কুদরতে সানীয়া। খিলাফত কোন বংশে সীমাবদ্ধ নেই। যে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তাআলা খলীফা নিযুক্ত করতে পারেন। কারণ খলীফা করা খোদার কাজ। খলীফা রাজনীতি বা যুদ্ধের মাধ্যমে কায়েম হয় না। শীয়ারা বলে ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ৪৮ বৎসর পর কারবালার যুদ্ধ হয়ে ছিল ইমামত কায়েম করার জন্য। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। নবুওয়ত যেমন লড়াই করে কায়েম করা যায় না তেমনি নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত বা ইমামতও যুদ্ধ করে কায়েম করা যায় না। খলীফা হন উচ্চ পর্যায়ের মু'মিনদের ভোটে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়।

বাংলার মুসলমানরা বিগত শত বৎসর যাবৎ এই খিলাফতের জন্য অপেক্ষা করে আসছে। আল এছলাম পত্রিকা লিখেছে, "খেলাফত রক্ষা না হইলে ... মুছলমান জাতির সর্বনাশ! মস্তকবিহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নাই, খলীফাবিহীন মুছলমান জাতিরও সেরূপ কোন গুরুত্ব থাকিতে পারে না। খলীফা এছলাম ধর্ম ও মুছলমান জাতির মেরুদন্ডস্বরূপ (৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৭ বাংলা)। অন্যত্র বলা হয়েছে, "শরীয়তের বিধান অনুসারে খলীফা নির্বাচনে করা মুসলমানের পক্ষে ওয়াজিব। খলীফাহীন ইসলাম কর্ণধার বিহীন তরণীর তুল্য বিপন্ন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। এই জন্য মোসলেম জগতের পক্ষে খলীফা নির্বাচন করা ওয়াজেব হইয়াছে। উহা না করা পাপ ও ধর্মবিচ্যুতি এবং নির্বাচিত খলীফাকে না মানা ধর্মদ্রোহিতা (ইসলামদর্শন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৭ বাংলা)। এই সব উক্তি আহমদী জামাতের দ্বিতীয় খলীফার খিলাফতের প্রথম দিকে করা হয়েছিল। আজকাল আর এ ধরনের চীৎকার শোনা যায় না। অথচ ৯৪ বৎসর যাবৎ এই খিলাফত সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। যারা খিলাফতের জন্য ব্যাকুল ছিলেন তারা মরে গেছেন। আজ যারা জীবিত আছে তারা খিলাফতকে ভুলে গিয়ে রাজনীতি নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত। তারা খলীফা চায় না চায় দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন 'ইসলামী শাসন'। অথচ খলীফা ছাড়া প্রকৃত ইসলামী শাসন কায়েমই হতে পারে না। হে বাংলাদেশের মানুষ পূর্ববর্তীদের মূল্যবান বাণীগুলি আপনারা মূল্যায়ন করবেন কি?

- আহমদ তৌফিক চৌধুরী

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(১৩তম কিস্তি)

পুরো কুরআন তিলাওয়াত শেষ করে দোয়া

♦ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পুরো কুরআন পাঠ শেষ করার পরে এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِیْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَ هُدًی وَ رَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِیْ مِنْهُ مَا نَسِیْتُ وَ عَلِّمْنِیْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِیْ تِلَاوَتَهٗ آنَاءَ اللَّیْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِیْ حُجَّةً یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔

(احیاء علوم الدین للغزالی جزاول صفحہ ۲۷۸ مطبوعہ بیروت)

(আল্লাহুম্মারহামনী বিল কুরআনি ওয়াজ আলাহুলী ইমামাঁওয়া নূরাঁওয়া হুদাঁওয়ারহমাতান আল্লাহুম্মা যাক্কিরনী মিনহু মা নাসী'তু ওয়া আল্লীমনী মিনহু মা জাহিলতু ওয়ারযুক্বনী তিলাওয়াতাহূ আলায়াল্লায়লি ওয়া আতূরাফান্নাহারি ওয়াজ'আলহুলী হুজ্জাতান ইয়ারব্বাল 'আলামীন- ইমাম গায্যালী প্রণীত ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮, বৈরুত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! কুরআনের কারণে ও দোহাইতে তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। আর কুরআনকে আমার জন্যে নেতা, জ্যোতিঃ ও রহমতস্বরূপ করো। হে আল্লাহ্! আমি এথেকে যা ভুলে যাই তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও এবং এথেকে যা আমি বুঝি না তা আমাকে শিখিয়ে দাও। আর রাত ও দিনের বিভিন্ন অংশে এর তিলাওয়াতকে আমার জীবনোপকরণ করে দাও। হে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি একে আমার জন্যে দলীলস্বরূপ করে দাও, আমীন।

নতুন চাঁদ দেখে দোয়া

♦ হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَیْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِیْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّیْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ ،هِلَالُ خَیْرٍ وَّ رُشْدٍ،هِلَالُ خَیْرٍ وَّ رُشْدٍ،اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَكَ۔

(ترمذی کتاب الدعوات ومستدرک حاکم کتاب الدعاء)

(আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলায়না বিন আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস্ সালামাতি ওয়াল ইসলামি রব্বি ও রব্বুকাল্লাহু হিলালুন খয়রিঁ ওয়া রুশদিন হিলালু খয়রিঁওয়া রুশদিন হিলালুন খয়রিঁওয়া রুশদিন আমানতু বিল্লাহিল্লাযী খলাক্বকা- তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত এবং মুস্তাদরক হাকেম, কিতাবুদ্দুয়া)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! এ (চাঁদ)-কে আমাদের প্রতি নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের চাঁদরূপে উদিত করো। হে চাঁদ আমার ও তোমার প্রভু - প্রতিপালক আল্লাহ্। এ চাঁদ মঙ্গল ও কল্যাণের চাঁদ হোক, মঙ্গল ও কল্যাণের চাঁদ হোক, মঙ্গল ও কল্যাণের চাঁদ হোক, আমি ঐ আল্লাহ্র ওপরে ঈমান এনেছি যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

রোযা ইফতার করার দোয়া

♦ হযরত মুআয (রাঃ) বিন জাহেরাহ্ বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম রোযা ইফতার করার সময় এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰی رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ۔

(আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া 'আলা রিয্ক্বিকা আফত্বারতু - আবূ দাউদ কিতাবুস্ সওম)

হে আল্লাহ্! তোমার উদ্দেশ্যেই আমি রোযা রেখেছিলাম আর তোমার (দেয়া) রিয্ক দিয়ে আমি ইফতার করছি অর্থাৎ রোযা খুলছি।

♦ হযরত আমর (রাঃ) বিন আল্ আস রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছেন, রোযাদারের ইফতারের সময় দোয়ার কবুলিয়তের একটি বিশেষ সুযোগ আসে [তিনি (সঃ) এ দোয়া পড়লেন]

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ اَنْ تَغْفِرَلِیْ ذُنُوْبِیْ۔ (مستدرک حاکم کتاب الصوم)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিরহমাতি-কাল্লাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শায়ঈন আন তাগফিরালী যুনূবী - মুস্তাদরক হাকেম, কিতাবুস্ সওম)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছ থেকে তোমার এ রহমতের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট চাচ্ছি যাব কর্তৃত্ব প্রত্যেক বস্তুর ওপরে ছেয়ে আছে যে, তুমি আমার পাপ ক্ষমা করো।

লায়লাতুল ক্বদরের দোয়া

♦ হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি আমি লায়লাতুল ক্বদর পাই তাহলে কী দোয়া করবো? তিনি বল্লেন, এ দোয়া করো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِیْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ۔

(ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউন কারীমুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নি (তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি মূর্তিমান ক্ষমা, দাতা, তুমি ক্ষমাকে পসন্দ করো সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

ইহরামের দোয়া - তালবীয়াহ্

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ইহরাম বেঁধে এ কথা দ্বারা তালবীয়াহ্ পড়তে শুনেছি ঃ

لَبَّیْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّیْكَ لَبَّیْكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ لَبَّیْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِیْكَ لَكَ۔

(بخاری کتاب اللباس)

(লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়কা ইন্নাল হাম্দা ওয়া নি'মাতা লাকা ওয়াল খুলকা লা শারীকা লাকা - বুখারী, কিতাবুল্ লিবাস)।

অর্থ ঃ উপস্থিত আছি। হে আল্লাহ্। আমি উপস্থিত আছি, উপস্থিত আছি। তোমার কোন অংশী নেই। আমি উপস্থিত আছি। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা ও কল্যাণ তোমারই। এবং আধিপত্যও তোমারই। তোমার কোন অংশী নেই।

বায়তুল্লাহ্ বা কা'বা ঘর দর্শনের পরে দোয়া

♦ হযরত হুযায়ফা বিন উসায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র ঘর কা'বা দেখতেন তখন এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّ بِرًّا وَّ مَهَابَةً وَّ زِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَ عَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَ اعْتَمَرَهُ تَعْظِيْمًا وَّ تَشْرِيْفًا وَّ بِرًّا وَّ مَهَابَةً۔

(مجمع الزوائد ہیثمی مطبوعہ بیروت جلد ٣ صفحہ ٢٣٨)

(আল্লাহুম্মা যিদ বায়তাকা হাযা তাশরী-ফাঁওয়া তা'যীমাঁওয়া তাকরীমাঁওয়া বিররাঁ-ওয়া মাসাবাতাঁওয়া যিদ মান শাররাফাহূ ওয়া 'আয্যামাহূ মিম্মান হাজ্জাহূ ওয়া' তামারা-হূতা'যীমাঁওয়া তাশরীফাঁওয়া বির্রাঁ ওয়া মাসাবাতান- মাজমুআ যযওয়ায়েদ হায়সামি, বৈরুতে ছাপা, ৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার এ ঘরের সম্মান, মাহাত্ম্য, ইজ্জত, পুণ্য ও প্রভাবে বাড়িয়ে দাও। আর হজ্জ ও উমরাহ্কারীদের মধ্যে যারা একে পবিত্র জ্ঞান করে ও সম্মান দেয় তাদেরকে মাহাত্ম্য, সম্মান, পুণ্য ও প্রভাবে বাড়িয়ে দাও।

বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করার দোয়া

◆ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সায়েব (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করার সময় এ দোয়া পড়তে শুনেছেন। (মুযদালিফাতেও এ দোয়া পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়)।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (ابوداؤد کتاب المناسک)

(রব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতাঁওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁওয়াক্বিনা 'আযাবান্নার - *আবূদাউদ, কিতাবুল মানাসিক*)

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আমাদেরকে ইহকালের সফলতা দাও এবং পরকালের সফলতাও এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

সাফা ও মারওয়া পর্বতে স'ই করার দোয়া

◆ হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন আবী আওফা বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সাফা ও মারওয়া পর্বতের মাঝে স'ই (দৌড়াদৌড়ি) করার সময় ২১ বার আল্লাহ্ আকবর বলতেন (ইবনে আবী শায়বা প্রণেতা, ১০ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৭, বৈরুতে ছাপা)।

◆ হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) হজ্জ করার সময় সাফা পর্বতে উঠলে যখন তাঁর (সঃ) বায়তুল্লাহ্র দিকে দৃষ্টি যেতো তখন তিনি ৩ বার এ বাক্য পড়তেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔ (مسلم کتاب الحج)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লিশায়ইন ক্বদীর (মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ)

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশী নেই। আধিপত্য তাঁরই আর প্রশংসাও তাঁরই। এবং তিনি (যা চান) সব কিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান।

অন্য বর্ণনায় আরাফাতের মাঠেও এ বাক্যই পাঠ করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সাফা পর্বতে দোয়া

◆ হযরত উমর (রাঃ) হাজ্জ করার সময় সাফা পর্বতে এ দোয়া পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ "اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ" وَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ، وَ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَّا تَنْزِعَهٗ مِنِّىْ، حَتّٰى تَتَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ۔

(موطا کتاب الحج)

(আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ক্বুলতা (উদ'উনী আস তাজিবলাকুম) ওয়া ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদা- ওয়া ইন্নী আসয়ালুকা কামা হাদায়তানী লিল ইসলামি আল্লা তানযিআহূ হাত্তা তা তাওয়াফ্ফানী ওয়া আনা মুসলিমুন - মুয়াত্তা, কিতাবুল হাজ্জ)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি স্বয়ং একথা বলেছো (আমার নিকট দোয়া করো আমি তোমাদের দোয়া শুনবো) আর নিশ্চয় তুমি তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। আর নিশ্চয় আমি তোমার কাছে (এ অঙ্গীকারের দোয়াই দিয়ে) দোয়া করছি, এই যে, ইসলামের দিকে তুমি আমাকে হেদায়াত দিয়েছো এ নেয়ামত আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিও না এমন কি আমাকে এমন অবস্থায় মৃত্যু দিও যেন আমি মুসলমান থাকি।

আরাফাতের মাঠে আকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটিপূর্ণ দোয়া

◆ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। হুজ্জাতুল বিদা'-এর দিনে নবী করীম (সঃ) আরাফাতের মাঠে সন্ধ্যাকালে এ দোয়া করেছেন।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَتَرٰى مَكَانِىْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ لَا يَخْفٰى عَلَيْكَ شَىْءٌ مِّنْ اَمْرِىْ وَاَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهٖ اَسْاَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمِسْكِيْنِ، وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهٗ وَ فَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهٗ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهٗ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهٗ، اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَّكُنْ بِىْ رَءُوْفًا رَّحِيْمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ۔

(مجمع الزوائد ہیثمی مطبوعہ بیروت جلد ٣ صفحہ ٢٥٢ و طبرانی جلد ١١ صفحہ ١٧٤ مطبوعہ بیروت)

(আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তাসমাউ কালামী ওয়া তারা মাকানী ওয়া তা'লামু সির্‌রী ওয়া 'আলানিয়াতী লা ইয়াখফা 'আলায়কা শায়উঁম্মিন আমরী ওয়া আনাল বায়িসুল ফাক্বীরুল মুসতাগীসুল মুসতাজীরুল ওয়াজিলুল মুশফিকুল মুক্বির্‌রুল মু'তারিফু বি যাম্বিহী আসয়ালুকা মাস্‌য়ালাতাল মিসকীন- ওয়াব্‌তাহিলু ইলায়কা ইব্‌তিহালাল মুযনিবিয্‌যালীলি ওয়া আদ'উকা দু'আয়াল খাইফিয্‌ যারীরি মান খাযা'আত লাকা রক্বাতুহূ ওয়া ফাযাত লাকা 'আবরাতুহূ ওয়া যাল্লা লাকা জিসমুহূ ওয়া রগিমালাকা আনফুহূ-আল্লাহুম্মা লা তাজ'আলনী বিদু'আয়িকা শাক্বিয়্যাঁওয়া কুন বী রউফান রহীমান ইয়া খয়রাল মাসউলীনা ওয়া ইয়া খয়রাল মু'তীনা - তিররানী, ১১ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৪, বৈরুত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার কথা শুনছো। এবং আমার অবস্থা দেখছো। আর আমার গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়াদি ভালভাবে জানো। আমার কোন বিষয়ই তোমার নিকটে গোপন নেই। আমি একটি দুরবস্থায় পতিত ভিখারী আর মুখাপেক্ষীই আছি। তোমার সাহায্যের ও 'আশ্রয়ের প্রত্যাশী, শঙ্কিত ও ভীত। নিজের পাপসমূহ স্বীকার করছি আর স্বীকার করে তোমার কাছে (চলে) এসেছি। আমি তোমার নিকট এক দীন হীন ভিখারীর মত যাচ্ঞা করছি। তোমার দরবারে এক ঘোরতর পাপীর মত কান্নাকাটি করছি। এক অন্ধ অর্বাচীনের মত (হোঁচট খেয়ে) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তোমার নিকট দোয়া করছি। আমার মস্তক তোমার প্রতি ঝুঁকে রয়েছে আর আমার চোখের পানি তোমার পানে বহমান। আমার দেহ তোমার প্রতি অনুগত হয়ে সিজদায় পড়ে আছে আর নাক ধূলিমন্ডিত হচ্ছে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার দরবারে দোয়া করতে দুর্ভাগা করে তাড়িয়ে দিও না আর আমার সাথে দয়া ও করুণার আচরণ করো। হে ঐ সত্তা, যিনি সবচে' বেশি কাতর অনুনয়-বিনয় কবুল করে থাকো আর সবচে' উত্তম দানকারী। আমার দোয়া কবুল করো। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুলের তোড়া
(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

মূল ঃ আমাতুল বারী নাসের ও বুশরা দাউদ

(১১ম কিস্তি)

সূরাতুল বাকারাহ্-২

১২৯। রব্বানা ওয়াজ'আলনা মুসলিমায়নি লাকা
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক এবং আমাদেরকে বানাও অনুগত তোমার প্রতি

ওয়ামিন যুররিয়্যাতিনা উম্মাতান মুসলিমাতান লাকা
এবং হতে আমাদের বংশধরদের এক উম্মত অনুগত তোমার প্রতি

ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়াতুব আলায়না ইন্নাকা
আর আমাদেরকে দেখাও আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি এবং করুণা ভরে আমাদের নিশ্চয় তওবা গ্রহণ করো

আনতাত্তাওয়াবা আররহীম ১৩০। রব্বানা
তুমিই তওবা গ্রহণকারী বার বার কৃপাকারী। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক

ওয়াব্'আস ফীহিম রসূলান মিনহুম ইয়াতলূ
এবং আবির্ভূত করো তাদের মাঝে এক রসূল তাদের মধ্য থেকে পড়ে

আলায়হিম আয়াতিকা ওয়া ইউআল্লিমুহুম আল্ কিতাব
তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ আর তাদেরকে শিখায় কিতাব

ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কিহিম ইন্নাকা আনতা 'আল্ আযীয
এবং প্রজ্ঞা আর তাদেরকে পবিত্র করে নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী

আল্ হাকীম ১৩০। ওয়ামাঁইয়ারগাব আঁম্মিল্লাতি ইবরাহীমা
পরম প্রজ্ঞাময়। এবং বিমুখ করে না সে ইব্রাহীমের ধর্ম থেকে

ইল্লা মান সাফিহা নাফসাহূ ওয়া লা... ইসতাফাইনাহূ
ছাড়া যে নির্বোধ করেছে নিজেকে আর নিশ্চয় আমরা মনোনীত করেছি তাকে

ফিদ্দুনয়া ওয়া ইন্নাহূ ফিল আখিরাতি লামিনাস্ সলেহীন
ইহকালে এবং নিশ্চয় সে পরকালে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৩২। ইয ক্বালা লাহূ রব্বুহূ আসলিম ক্বালা
যখন তাকে বল্লেন তার প্রভু-প্রতিপালক আত্মসমর্পণ কর সে বললো

আসলামতু লিরব্বিল আলামীন ১৩৩। ওয়া ওয়াস্সা
আমি আত্মসমর্পণ করলাম বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে। এবং নির্দেশ দেন

বিহা ইব্রাহীমু বানীহি ওয়া ইয়াকুব
এর (আত্মসমর্পণের) ইব্রাহীম তার সন্তানদেরকে আর ইয়াকুব (ও)

ইয়া বানীয়া ইন্নাল্লাহা ইসতাফা লাকুম
হে আমার পুত্ররা নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন তোমাকে

আদ্দীন ফালা তামূতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমূন
এ ধর্ম অতএব তোমরা ছাড়া তোমরা এমতাবস্থায় যে, মুসলমান হও। মারা যেও না

১৩৪। আম কুনতুম শুহাদায়া ইয হাযারা ইয়া'কূবা
তোমরা কি ছিলে উপস্থিত যখন এসেছিলো ইয়াকুবের

আল্ মাওত ইয ক্বালা লি বানীহি মা
মৃত্যু যখন সে বলেছিলো তার পুত্রদের উদ্দেশ্যে কাকে

তা'বুদূনা বা'দী ক্বালূ না'বুদূ
তোমরা উপাসনা করবে আমার পরে তারা বলেছিলো আমরা উপাসনা করবো

ইলাহাকা ওয়া ইলাহা আবায়িকা ইব্রাহীমা ওয়া
তোমার মাবূদের ও মা'বূদের তোমার বাপ-দাদার ইব্রাহীম ও

ইসমাঈলা ওয়া ইসহাকা ইলাহান ওয়াহিদান
ইসমাঈল এবং ইসহাকের এক-অদ্বিতীয় মা'বূদকে

ওয়া নাহনূ লাহূ মুসলিমূন ১৩৫। তিলকা
আর আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণকারী। এ

উম্মাতুন ক্বদখলাত লাহা মা কাসাবাত
উম্মত, জামাত অবশ্যই চলে গেছে তাদের জন্যে যা তারা অর্জন করেছিলো

ওয়া লাকু মা কাসাবতুম ওয়ালা তুসয়ালূনা
এবং তোমাদের জন্যে যা তোমরা অর্জন করেছো এবং তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না

আম্মা কানূ ইয়া'মালূন ১৩৬। ওয়াকালূ
উহা ছিল যা তারা করতো। আর তারা বলেছিলো

কূনূ হূদান আও নাসারা তাহ্তাদূ
তোমরা হয়ে যাও ইহুদী অথবা খৃষ্টান তোমরা হেদায়াত পেয়ে যাবে

কুল বাল মিল্লাতা ইব্রাহীমা হানীফা ওয়া'মা
তুমি বলে দাও বরং ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ একত্ববাদী এবং না

কানা মিনাল মুশরিকীন ১৩৭। কূলূ আমান্না
ছিলো মুশরিক বা অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা বলো ঈমান এনেছি আমরা

বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলায়না ওয়ামা
আল্লাহ্র প্রতি আর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা

উনযিলা ইলা ইব্রাহীমা ওয়া ইসমাঈলা ওয়া ইসহাক্বা
অবতীর্ণ করা হয়েছে ইব্রাহীমের প্রতি ও ইসমাঈলের ও ইসহাকের

ওয়া ইয়া'কূবা ওয়াল আসবাত্বি ওয়ামা উতিয়া
ও ইয়াকুবের আর (তাদের) সন্তানদের এবং যা দেয়া হয়েছে

মূসা ওয়া ঈসা ওয়ামাউতিয়া আন্নাবীয়্যুনা
মূসা ও ঈসা এবং যা দেয়া হয়েছে (অন্যান্য) নবীদেরকে

মিররব্বিহিম লা নুফার্‌রিকু বায়নাআহদিম্
তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমরা পার্থক্য করি না কারও মাঝে

মিনহুম ওয়ানাহনু লাহূ মুসলিমূন
তাদের থেকে এবং আমরা তাঁর (খোদার) প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

১৩৮। ফাইন আমানূ বিমিসলি মা আমানতুম-
আবার যদি ঈমান আনো তোমরা তার মত তার প্রতি যে-

বিহী ফাক্বদ ইহ্তাদা ওয়া ইন তওয়াল্লাওহ্
তোমার ঈমান তাহলে নিশ্চয় তারা হেদায়াত এবং যদি তোমরা এনেছো পেয়ে গেছে ফিরে যাও

ফাইন্নামা ফী শিক্বাক্বিন ফাসাইয়াকফীকাহুমু-
তাহলে নিশ্চয় বিরোধিতায় অতএব তোমার জন্যে তাদের তারা নয়

আল্লাহু ওয়া হুয়া আস্ সামী'উন 'আলীমুন
মোকাবেলায় আল্লাহ্ যথেষ্ট এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ

১৩৯। সিবগাতাল্লাহি ওয়ামান আহসানু মিনাল্লাহি
আল্লাহ্র পদ্ধতি বা রং (অবলম্বন করো) আর কে উত্তম আল্লাহ্র চেয়ে

সিবগাতান ওয়া নাহনু লাহূ আবিদূনা
পদ্ধতিতে আর আমরা তার উদ্দেশ্যে উপাসনাকারী।

১৪০। কুল আতুহাজ্জুনানা ফিল্লাহি ওয়া হুয়া
তুমি বলো তোমরা কি আমাদের সাথে ঝগড়া করছো আল্লাহ্র প্রসঙ্গে এবং তিনি

রব্বুনা ওয়া রব্বুকুম ওয়া লানা আ'মালুনা
আমাদের প্রভু-প্রতিপালক ও তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আর আমাদের জন্যে আমাদের কাজ

ওয়া লাকুম আ'মালুকুম ওয়া নাহনু লাহূ
ও তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ এবং আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে

মুখলিসূনা ১৪১। আমতাকুলূনা ইন্না ইব্‌রাহীমা
আমরা একনিষ্ঠ তোমরা কি বলছো নিশ্চয় ইব্রাহীম

ওয়া ইসমাঈলা ওয়া ইসহাক্বা ওয়া ইয়া'কূবা ওয়াল
ও ইসমাঈল ও ইসহাক ওয়া ইয়াকূব এবং

আসবাত্বা কানূ হূদান আও নাসারা কুল
(তাদের) সন্তানরা ইহুদী ছিলো বা খৃষ্টান তুমি বলো

আআনতুম আ'লামু আমিল্লাহু ওয়া মান আযলামু
তোমরা কি বেশি জানো অথবা আল্লাহ্, আর অধিক জালিম

মিম্মান কাতামা শাহাদাতান ইনদাহূ মিনাল্লাহি
ঐ ব্যক্তি থেকে যে লুকিয়ে রাখে সাক্ষ্য (যা) তাদের কাছে আছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে

ওয়া মাল্লাহু বিগাফিলিন আম্মা তা'মালূন
আর আল্লাহ্ নন অমনোযোগী তাথেকে যা তোমরা করো।

১৪২। তিলকাউম্মাতুন ক্বদ খালাত লাহা মা কাসাবাত
এ এক জামাত অবশ্যই গত হয়ে গেছে তার জন্যে যা সে অর্জন করেছে

ওয়া লাকুম মা কাসাবতুম ওয়ালা তুসয়ালূনা
এবং তোমাদের জন্যে তোমরা যা অর্জন করেছো এবং তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না

আম্মা কানূ ইয়া'মালূন
উহার প্রসঙ্গে যা ছিলো তারা করতে।

(চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ওয়াকেফীনে নও-এর শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

মূল ঃ ডঃ শামীম আহমদ, ইনচার্জ কেন্দ্রীয় ওয়াকফে নও বিভাগ, লন্ডন

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) তাঁর বিভিন্ন খুতবা ও ভাষণে ওয়াক্‌ফে-নওয়ের শিশুদেরকে শিক্ষা দেয়ার সম্পর্কে সুবিস্তারিতভাবে হেদায়াত ও নির্দেশনা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার দিকে অনেক মনযোগী হবার জন্যে তাগিদ করেছেন। তাঁর হেদায়াত ও নির্দেশাবলীর আলোকে ওয়াকেফীনে নও-এর শিক্ষা-দীক্ষা প্রসঙ্গে কিছু বিষয় উপস্থাপন করা হচ্ছে ঃ

কুরআন শিক্ষা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) তাঁর খুতবায় বলেন, ওয়াক্‌ফে নও শিশুদেরকে শুরু থেকে আন্তরিকভাবে কুরআন করীম শেখার দিকে মনোযোগী করে তোলা উচিত। তাদেরকে কুরআন খোওয়ানী (সুন্দর ও শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ) শিক্ষা দিন এবং এর সাথে সাথে কুরআনের মর্ম ও অর্থ শিখান। তিনি বলেন ঃ

'ক্বারী' (যে শুদ্ধ করে কুরআন পাঠ করতে পারে - অনুবাদক) দু'প্রকারের হয়ে থাকেন। এক, যারা ভাল তিলাওয়াত করেন, যাদের আওয়াজে আকর্ষণ রয়েছে এবং তাজভীদ (ক্বারীয়ানা পাঠ)-এর দিক দিয়ে তাদের তিলাওয়াত শুদ্ধও হয়ে থাকে। কিন্তু কেবল আকর্ষণীয় কণ্ঠের দ্বারা তিলাওয়াতে প্রাণসঞ্চারিত হয় না। এরূপ ক্বারীগণ যদি কুরআন করীমের অর্থ না জেনে থাকেন (অর্থ সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে থাকেন) তাহলে তারা তিলাওয়াতের প্রতিমা (খোলস) তো বানাতে পারেন কিন্তু তিলাওয়াতের জীবন্ত (প্রাণবন্ত) আকৃতি তৈরী করতে পারেন না। কিন্তু যে সকল ক্বারী বুঝে সুঝে (অর্থ সচেতন) তিলাওয়াত করেন এবং তিলাওয়াত (কৃত অংশ)-এর ঐ বিষয়-বস্তুর ফলশ্রুতিতে যাদের অন্তর বিগলিত হতে থাকে তাদের তিলাওয়াতে এমন এক জিনিস সৃষ্টি হয়ে যায় যা প্রকৃত পক্ষে তিলাওয়াতের 'রূহ' (প্রাণ) হয়ে থাকে। অতএব যে-সব ঘরে ওয়াক্‌ফে নওয়ের জীবন উৎসর্গকারীরা রয়েছে সেখানে তিলাওয়াতের এ দিকটির ওপরে অনেক জোর দেয়া উচিত যদিও কিনা অল্প অল্প পড়ানো হোক কিন্তু তরজমার সাথে, মমার্থ বর্ণনা করার মাধ্যমে পড়ানো হোক এবং শিশুদের অভ্যাস করানো হোক যেন তারা যা কিছু তিলাওয়াত করবে তা বুঝে সুঝে করবে" (খুতবা জুমুআ, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ইং তারিখে প্রদত্ত)।

সৈয়্যদনা হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশনা মোতাবেক এরূপ ভিডিও ক্যাসেট তৈরী করা হয়েছে যেগুলোর সাহায্যে তাজভীদ (অক্ষরকে সঠিকভাবে উচ্চারণ)-এর দিক দিয়ে সঠিক তিলাওয়াত শিখা ও শেখানো অত্যন্ত সহজ। এ সকল ভিডিও ক্যাসেট প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় মিশন হাউজ থেকে সহজলভ্য হওয়া উচিত। তাছাড়া, লন্ডন মিশন হাউজ এবং রাবওয়াহ্ থেকেও সংগ্রহ করা যায়। পিতা-মাতাদের উচিত এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা। নিজেরাও শিখুন এবং শিশুদেরকেও শিখান। এতে যদি বাবা-মায়েরা নিজেদেরকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে দেখেন তাহলে নিজেদের জামাতের সেক্রেটারী, ওয়াকফে নও বা আমীর / প্রেসিডেন্ট সাহেবানের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিন, তাদের জামাতে কে তাদের সাহায্য করতে পারেন। অবস্থা যেরূপই হোক তাদের শিশুরা যাতে অবশ্যই সঠিক তাজভীদের সাথে তিলাওয়াত করতে পারে এবং বয়স অনুযায়ী তরজমাও শিখে যেমন করেই হোক তা নিশ্চিত করুন। প্রত্যেক স্তরের ওয়াক্‌ফে নও সেক্রেটারী সাহেবানের উচিত এ ব্যাপারটির দিকে যেন সবিশেষ মনোযোগ দেন এবং এটাকে নিজেদের কর্তব্যসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে নেন আর নিজেদের প্রচেষ্টা ও কার্যাবলীর রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাতে থাকেন।

তাছাড়াও, কুরআন করীমের জ্ঞানরাশির এক অত্যন্ত মূল্যবান ভান্ডার হচ্ছে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর বিভিন্ন সময় দেয়া দরসুল কুরআন যা ভিডিও-এর ওপর রেকর্ড করা হয়েছে। জামাতসমূহের উচিত, হুযূর (আইঃ)-এর ঐ দরসগুলোকে একত্র করা এবং নিজেদের জামাতে ভিডিও লাইব্রেরী স্থাপন করা যাতে মাতা-পিতা ও ওয়াক্‌ফে নওয়ের উৎসর্গকারী ছেলে-মেয়েরা সেগুলি কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে পারে।

ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ওয়াকেফীনে নও ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানে ব্যাপকতা সৃষ্টির জন্য অনেক মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির একটি পন্থা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় পত্র-পত্রিকাগুলো যেন পড়া হয়। বিভিন্ন দেশে জামাত বা অংগসংগঠনসমূহের ব্যবস্থাধীনে স্থানীয় ভাষায় পত্র-পত্রিকা / বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে ওয়াকেফীনে নও ছেলে-মেয়েদের সেগুলো পাঠ করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। আর সেগুলোতে সম্ভব হলে ওয়াকেফীনে নও-এর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তাদের বয়স, যোগ্যতা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধাদি ছাপা হোক। এ প্রবন্ধগুলাতে জানানো হোক, ওয়াক্‌ফে নও স্কীমটি কী এবং ওয়াকেফীনে নও ছেলে-মেয়েদের কাছে জামাত কী প্রত্যাশা করে চেয়ে আছে। এ প্রবন্ধগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান বাড়াবার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। যেমন, বিভিন্ন জাতি ও দেশের অবস্থাবলী, তাদের উত্থান-পতনের কারণাদি ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্যাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সৈয়্যদনা হুযূর (আইঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ "ওয়াকেফীন ছেলে-মেয়েদের জ্ঞান ব্যাপকভিত্তিক হওয়া উচিত। সাধারণতঃ ধর্মীয় আলেমদের মধ্যে এ দুর্বলতাই দেখা যায় যে, ধর্মীয় জ্ঞানের দিক দিয়ে তো তাদের জ্ঞান যথেষ্ট ব্যাপক এবং গভীরও হয়ে থাকে, কিন্তু ধর্মীয় গন্ডির বাইরে অন্যান্য জাগতিক ক্ষেত্রে তারা একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে থাকেন। জ্ঞানের এই ত্রুটি বা অভাব ইসলামের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। যে সব বিষয় ধর্মসমূহের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেগুলোর মধ্যে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সেজন্যে আহমদীয়া জামাতের এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং জ্ঞানের ব্যাপকভিত্তিক ধর্মীয় জ্ঞানকে বাড়ানো উচিত অর্থাৎ প্রথমে সাধারণ জাগতিক জ্ঞানের ভিত্তি ব্যাপক হোক তারপর তাতে ধর্মীয় জ্ঞান যোগ হোক, তাহলে অতি সুন্দর ও বরকতমন্ডিত এক 'শাজারা তৈয়্যবা' (পবিত্র বৃক্ষ) সৃষ্টি হতে পারে" (খুতবা জুমুআ, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ইং)।

কোন এক উপলক্ষ্যে সৈয়্যদনা হুযূর (আইঃ) হেদায়াত ও নির্দেশাবলী দিতে গিয়ে বলেন ঃ "শিশুদের মেধার ও মানসিক বিকাশের যদ্দুর সম্পর্ক তার জন্য আবশ্যক যেন ব্যাপক পরিসরে তাদের মেধার বিকাশ ও যোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলার আয়োজন করা হয়। ওয়াকেফীনে নওদের শিক্ষা-দীক্ষার উন্মুক্ত ও অ-আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি এ হওয়া উচিত যে, কয়েকটি সিলেবাসভুক্ত বই-পুস্তক নির্ধারণ করার পরিবর্তে, এরূপ বই-পুস্তকের ব্যাপক তালিকা থাকবে যেগুলো শিশুরা নিজেরা পড়বে এবং মাথায় কোন চাপ প্রয়োগ ছাড়াই পড়বে। ঐ সকল বই- পুস্তকের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যাবে যাতে তাদের জ্ঞান প্রত্যেক অঙ্গণে ব্যাপকতা লাভ করে। কাজেই বাবা-মায়ের পুরোপুরি চেষ্টা করা উচিত যেন তাঁরা নিজেদের সন্তানদের সাধারণ জ্ঞান বাড়াবার দিকে মনোযোগী হন। শিশুদেরকে পত্র-পত্রিকার গ্রাহক বানিয়ে দেন এবং তাদের বই-পুস্তক পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলেন, যার ফলে তাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতা অর্জন করে। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে ছোটদের জন্য সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বই-পুস্তক অত্যন্ত সস্তা দামেই পাওয়া যায় যেগুলোতে অনেক প্রয়োজনীয় উপকারী তথ্যাদি থাকে এবং তা অত্যন্ত সহজ বোধ্য পদ্ধতিতে লেখা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে স্থানীয় পাঠাগারগুলো থেকে ওয়াকেফীনে নও-এর উপকৃত হবার অভ্যাস গড়ে তোলা হোক। শিশুদেরকে উৎসাহিত করা হোক, তারা যেন তাদের স্কুলের বা পাবলিক লাইব্রেরীগুলো থেকে ঐ ধরনের বই নিয়ে পড়ে। তাদের মাঝে সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা এই আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তেমনিভাবে যথাসম্ভব মা-বাবাদের উচিত, শিশুদেরকে যেন ওরূপ উপকারী তথ্য সম্বলিত বই-পুস্তক কিনে দিতে থাকেন। স্বয়ং শিশুদেরও সামর্থ্যানুযায়ী ভাল বই-পুস্তক কেনার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। সম্ভব হলে জামাত নিজেদের জায়গায় নিজস্ব গ্রন্থাগার (লাইব্রেরী) স্থাপন করুক যেখানে ধর্মীয় গ্রন্থাদি ছাড়াও সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে রচিত বই পুস্তক মজুদ থাকে যাতে ওয়াকেফীনে নও ছেলে-মেয়েরা সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। শিশুদেরকে তাদের বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে ছোট ছোট জ্ঞানমূলক ও গবেষণামূলক প্রজেক্ট দেয়া যেতে পারে, যেগুলির উপর তারা নিজেরা বই-পুস্তক ইত্যাদি ঘেঁটে যেন কাজ করে।

ওয়াকেফীনে নও শিশুদের পিতা-মাতাদের স্মরণ রাখা উচিত, ছেলেমেয়েদের তা'লীম তরবিয়ত (শিক্ষাদীক্ষা)-এর উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে যাতে তাদের নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা শিশুদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। এ প্রসঙ্গে অঙ্গ-সংগঠনসমূহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উচিত মায়েদের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেয়া, যাতে ভালভাল গল্প ও ছড়া শুনিয়ে, পবিত্র গুণগুণানি দিয়ে সাক্ষাৎ ভালবাসা ও আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে খোদাতাআলা ও তাঁর রসূলের এবং তাঁর ধর্মের ভালবাসা তাদের অন্তরে সৃষ্টি করেন। অনুরূপভাবে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময়ের বিভিন্ন বুযূর্গদের কুরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষার এবং দোয়া কবুলের ঘটনাবলী, বার বার প্রকাশিত নিদর্শনাবলী এবং তাহ্‌রীকে জাদীদ ইত্যাদির অধীনে যারা সমমর্যাদাপূর্ণ কুরবানীর স্বাক্ষর রেখেছে এমন ওয়াকেফীনের ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী অনেক উপকারী ও লাভজনক সাব্যস্ত হতে পারে।

ভাষা শেখা

সৈয়্যদনা হুযূর (আইঃ) ওয়াকেফীনের জন্য কমপক্ষে তিনটি ভাষা শেখা আবশ্যকীয় করেছেন- আরবী, উর্দূ এবং স্থানীয় বা জাতীয় ভাষা। ভাষা প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, ওয়াকেফীনের জন্য কেবল মৌলিক (প্রাথমিক) জ্ঞান যথেষ্ট নয় বরং সৈয়্যদনা হুযূর (আইঃ)-এর তীব্র (বড়ই) আকাঙ্ক্ষা, ওয়াকেফীন ছেলে-মেয়েরা যেন প্রত্যেক ভাষায় দক্ষ, পারদর্শী হয়। হুযূর বলেন ঃ "আমাদের ভাষাবিদের প্রয়োজন। সব রকম ভাষাবিদের প্রয়োজন, যারা লিখতেও পারদর্শী হয় এবং বলায়ও, যারা তরজমায় সামর্থ্যবান এবং প্রণয়নেও। ওরূপ তারা যতজনই হোক না কেন তা অপর্যাপ্ত হবে" (খুতবা জুমুআ, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ইং প্রদত্ত)।

ভাষা শেখা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেজন্য এ প্রসঙ্গে সূচনালগ্ন থেকেই মা-বাবাদের চেষ্টা করা উচিত তারা কীভাবে তাদের শিশুদেরকে বিভিন্ন ভাষা শিখাবেন। এ প্রসঙ্গে তারা যেন তাদের খোঁজ-খবর নেন কোন্ কোন্ ভাষা শেখার বন্দোবস্ত আছে। ইউরোপের দেশগুলোয় জাতীয় ভাষা ছাড়া স্কুলগুলোতে একটি ভাষা ঐচ্ছিক বিষয় (Optional subject)-স্বরূপ শেখানো হয়। এথেকে উপকৃত হওয়া দরকার। তাছাড়া, এসকল দেশে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে সন্ধ্যাকালীন ক্লাস চালু আছে। এগুলো ভাষা শেখার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। এ সকল ক্লাসে ভর্তির জন্য সাধারণতঃ বয়ঃসীমার কোন শর্ত নেই। যদি ওয়াকেফীনের পিতা-মাতাও ঐ ভাষাগুলো শিখতে শুরু করে দেন, তাহলে তা শিশুদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও লাভজনক হতে পারে। কেননা এভাবে তারা তাদের শিশুদের সাথে ঘরে কথোপকথনের অভ্যাস (practice) করতে পারবেন। তাছাড়া, বিভিন্ন ভাষা শিখার জন্য বই-পুস্তক ও সেগুলির ওডিও মজুদ রয়েছে যদিও একটু বেশি দাম পড়ে। অনুরূপভাবে এমটিএ-তে তুর্কি, ফ্রেঞ্চ ও অন্যান্য ভাষা শেখাবার প্রোগ্রাম উপস্থাপন করা হচ্ছে। আমীর / সদর সাহেবান, ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী ও তা'লীম সেক্রেটারী সাহেবানের উচিত তারা যেন খোঁজ-খবর নেন তাদের শহরে ও দেশে কী কী সুবিধা রয়েছে এবং সেগুলিকে কীভাবে আয়ত্ত করে তারা তাদের জামাতগুলোতে ওয়াকেফীনকে ভাষা শিখতে সাহায্য-সহায়তা করতে পারেন। তেমনিভাবে কোন জামাতে যদি আরবী অথবা অন্যান্য ভাষা জানেন এমন লোক পাওয়া যেতে পারে তাহলে তাদের মাধ্যমেও উপকৃত হওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে এ-ও নিবেদন করা যাচ্ছে যে, কোন জায়গায় যদি এমন কোন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে যা অন্যান্যদের জন্যও উপকারী হতে পারে তা যেন কেন্দ্রীয় ওয়াক্‌ফে নও বিভাগকেও জানান হয় যাতে তাঁদের সফল পদ্ধতি সম্বন্ধে অন্যদেরকেও অবহিত করা যায়। ভাষা শিক্ষার সম্পর্কে সৈয়্যদনা হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ "খুব ছোট বেলা থেকে যদি ভাষা সেখানো হয় তাহলে তা শিশুদের মস্তিষ্কে এত গভীর রেখাপাত করে যে, তারপর শিশুরা আসল ভাষাভাষীদের ন্যায় (ঐ সব ভাষায়) কথা বলতে পারে। আর বেশি বয়সে শেখা ভাষা, তাতে যত পরিশ্রমই করা হোক না কেন তা মূল ভাষা-ভাষীদের ন্যায় হয়ে ওঠে না। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন-মস্তিষ্ক যা চিন্তা করে তা শৈশবকাল থেকে শেখা ভাষায় তার চিন্তা-ভাবনা অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে শেখা ভাষার ক্ষেত্রে তাতে চিন্তা-ভাবনায় বাধা-বিপত্তি থাকে, ধীরে ধীরে

সাবধানে পা বাড়াতে হয়। কেউ কেউ যদিও অপেক্ষাকৃত কিছু দ্রুতবেগেও বাড়ায়, আর কেউ কেউ ধীর গতিতে কিন্তু যা স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত গতি তা সৃষ্টি হতে পারে না। সেজন্য প্রকৃত ভাষাভাষী বানাবার জন্য ছোটবেলা থেকেই ভাষা শেখাতে হয়। যদি দোলনায় ভাষা শেখানো যায় তাহলে তা-ও অনেক ভাল। বরং সবচেয়ে ভাল" (খুতবা জুমুআ, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ইং প্রদত্ত)।

আরবী শেখা

সৈয়্যদনা হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ "সবচেয়ে বেশি জোর সূচনালগ্ন থেকেই আরবী ভাষার ওপর দেয়া উচিত। কেননা একজন মুবাল্লেগ আরবীর গভীর অধ্যয়ন ব্যতিরেকে এবং এর সুক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম অর্থাবলীকে অনুধাবন করা ব্যতিরেকে কুরআন করীম ও আহাদীস নববী থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে না। সেজন্য বাল্যকাল থেকেই ভিত্তি আরবী ভাষার ওপর স্থাপন করা উচিত। আর উপায়-উপকরণ পাওয়ার সুযোগ হলে সেখানে এর কথোপকথনের প্রশিক্ষণও দেয়া উচিত" (খুতবা জুমুআ, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ইং প্রদত্ত)।

কোন কোন পিতা-মাতা ও ওয়াক্‌ফে নও সেক্রেটারী সাহেবান যোগাযোগ করে জানতে চান যে, তাদের শিশুদেরকে আরবী কীভাবে শেখাবেন। অধিকাংশ জায়গায় এই অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। এদিক দিয়ে খোঁজ-খবর নেয়া উচিত যে, তাঁদের নিজেদের জামাতে যদি কোন আরব ভদ্রলোক থাকেন তাহলে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য-সহায়তা নেয়া উচিত, যেন তিনি কিছু সময় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য দিতে পারেন। আরবীর প্রাথমিক বই-পুস্তক সংগ্রহ করে তা থেকে উপকার লাভ করা যায়। Linguafone নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে যা বিভিন্ন ভাষার বই-পুস্তক এবং ওডিও ভিডিও ক্যাসেট্‌স তৈরী করে থাকে। তাদের একটি কোর্স 'দুরূসুন ফিল আরাবীয়া' এর নামে অভিহিত, যা নিঃসন্দেহে একটি ভাল কোর্স। আমীর ও সদর সাহেবানের উচিত যেন নিজেদের জামাতগুলোর খোঁজ-খবর নেন, তাদের ওখানে আরবী শেখাবার কী ব্যবস্থা রয়েছে ও তাতে কী কী অসুবিধা বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং সেগুলোর সমাধান কী করে হতে পারে। যথাসম্ভব উল্লেখিত কোর্সটি তাদের জন্য সহায়ক সাব্যস্ত হতে পারে। মিশর থেকে 'রেডিও কাহেরা'-এর পক্ষ থেকে বেতার ব্যবস্থায় আরবী শিখাবার একটি প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত হয়। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা দার্সি (পাঠ্য) বই-পুস্তক বিনামূল্যে পাঠিয়ে থাকে। এসব বইয়ের ওডিও ক্যাসেট্‌সও তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যায়।

উর্দ্দূ শিক্ষা

উর্দ্দূ ভাষা ওয়াকেফীনের জন্য নিতান্তই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সৈয়্যদনা হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রণীত তত্ত্বপূর্ণ ইল্‌মূল কালাম বা সাহিত্যের বেশির ভাগ উর্দ্দূ ভাষায় রয়েছে। এ সকল রূহানী ভান্ডার থেকে যথার্থভাবে উপকৃত ও কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য উর্দ্দূ জানা অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া, সিলসিলার খলীফাগণের খুতবা, ভাষণ ও দরসুল কুরআন ইত্যাদির এবং সিলসিলার অন্যান্য বই-পুস্তকের অধিকাংশ উর্দ্দূ ভাষায়ই রয়েছে। সৈয়্যদনা হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীসমূহ উপলব্ধি করার ও ঈমানের পরিপক্কতার জন্য এ সকল গ্রন্থ পাঠ করা একান্ত জরুরী।

পাকিস্তানে তো স্কুল ও কলেজগুলিতে সাধারণতঃ উর্দ্দূ ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয় যদিও কিনা দেশের সাধারণ শিক্ষাগতমান নীচু হয়ে যাওয়ার দরুন লেখা, বক্তৃতা ও সাহিত্যিক ব্যুৎপত্তির মানও ক্রমশ নীচু হয়ে যাচ্ছে। ওয়াকেফীনকে সাধারণ দেশীয় মানের চেয়ে অনেক উত্তম ও উন্নত মানের উর্দ্দূ শিখতে হবে। সেজন্য তাদেরকে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের বাইরের ছেলে-মেয়েদেরকে উর্দ্দূ পড়ানো এক কঠিন কাজ। কেননা, এসব দেশে বসবাসরত ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন ভাষা ও শিক্ষাগত এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ছাড়া অন্যান্য সমস্যাও বাধা হয়ে থাকতে পারে। সেজন্য বাইরের ছেলে-মেয়েদেরকে উর্দ্দূ শিখানোর দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। পিতা-মাতার উচিত শুরু থেকেই যেন উর্দ্দূ পড়ান। পরবর্তীতে ওয়াকেফীনের জন্য উর্দ্দূ ক্লাসও অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত যা কমপক্ষে সপ্তাহে একবার এবং স্কুলে ছুটির সময়ে একাধিক বার অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে নও সাহেবানের কর্তব্য - তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, তাদের জামাতের ছেলে-মেয়েরা যাতে উর্দ্দূ শিখতে থাকে তা নিশ্চিত করা এবং ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তাদের উর্দ্দূর যোগ্যতা যাতে পাকিস্তানে মেট্রিকের ছেলে-মেয়েদের সমান হয়। এটা জরুরী নয় যে, সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে নও নিজেই পড়াবেন, বরং তাঁকে তা'লীমের সেক্রেটারী ও অঙ্গ সংগঠনসমূহ যেমন খুদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সহযোগিতাও গ্রহণ করা উচিত। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সংগঠন বিশেষতঃ মেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে অনেক সাহায্য করতে পারে। বাইরের ছেলে-মেয়েদের জন্য উর্দ্দূ কায়েদা বই মজুদ রয়েছে। এ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।

ছেলে-মেয়ে যখন ভালভাবে উর্দ্দূ পড়তে পারে তখন তাকে 'তাশহীযুল আযহান' পত্রিকার গ্রাহক বানিয়ে তা পড়তে দেয়া হোক। মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ করাচী ছেলে-মেয়েদের জন্য কয়েকটি উত্তম বই প্রকাশ করেছে তাও সংগ্রহ করে পড়ানো উচিত। ছেলে-মেয়েদের জন্য ইংরেজী ভাষায়ও অনেকগুলো বই লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করে তাদেরকে পড়ানো উচিত। অনুরূপ, বয়স বাড়ার সাথে সঙ্গতি রেখে মাসিক 'খালিদ' দৈনিক ও সাপ্তাহিক 'আল্ ফযল', 'দুররে সামীন', 'কালামে মাহ্‌মুদ', 'কালামে তাহের', ও 'দুররে আদান' পড়ার জন্য তাদেরকে মনোযোগী করা হোক। তারপর বয়সের সাথে সঙ্গতিক্রমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর 'মলফূযাত' ও গ্রন্থাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক।

ঐ সকল বাবা-মা, উর্দ্দূ যাঁদের মাতৃভাষা নয় তাদের নিকট অনুরোধ, ওয়াক্‌ফে নও-এর মুজাহিদীনকে উর্দ্দূ শেখাবার জন্য সাথে সাথে নিজেরাও উর্দ্দূ শিখুন যাতে তাঁরা নিজে ছেলে-মেয়েদেরকে পথপ্রদর্শন করতে পারেন। যদি তাদের জামাতে উর্দ্দূ জানেন এমন কেউ থাকেন তাহলে যথাসম্ভব তার সাহায্য নিন। যখন উর্দ্দূর যেসব বাক্য শিখে নেয়া হয় তখন সে বাক্যগুলো ছেলে-মেয়েদের সাথে দৈনন্দিন কথা-বার্তায় ব্যবহার করুন এবং যেখানেই সুযোগ হয়, উর্দ্দূ জানা বন্ধুদের সাথে উর্দ্দূ ভাষায় কথা বলুন। এরূপ পিতা-মাতার সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় ওয়াক্‌ফে নও বিভাগ, লন্ডন Foundation course in Urdu নামে একটি কায়েদা (প্রাথমিক শিক্ষার বই) প্রকাশ করেছে। তা নিজেদের দেশীয় কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে ও আশা করা যায় এটি প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য সহায়ক ও উপকারী হবে।

জাগতিক শিক্ষা

সৈয়্যদনা হুযূর (আইঃ) ওয়াকেফীন ছেলে-মেয়েদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে জাগতিক শিক্ষাও অতি জরুরী বলে ঘোষণা করেছেন যাতে তারা যখন কর্মক্ষেত্রে নামবে তখন তারা যেন প্রত্যেক প্রকারের জ্ঞানের অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে (গিয়ে) থাকে এবং অত্যন্ত আস্থার সাথে প্রত্যেক প্রকারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সফলভাবে করতে পারে। জাগতিক শিক্ষার বিভিন্ন শাখা এবং তা কী করে ওয়াকেফীনের জন্য সহায়ক ও লাভজনক হতে পারে তার বিস্তারিত আলোচনা বিগত একটি প্রবন্ধে এসে গেছে। পিতা-মাতাদের উচিত শুরু থেকেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া, তাদের শিক্ষাগত ক্রমোন্নতি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা। স্কুলের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাও অনেক উপকারী হয়ে থাকে। এদিকেও খেয়াল রাখা দরকার, স্কুলে বা পড়া-শোনায় তারা কোন অসুবিধা বা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না। যদি তেমন কিছু থাকে তাহলে শিক্ষকদের সাথে দেখা করে তার সমাধান খুঁজে বের করা উচিত। কোন কোন সময় ছেলে-মেয়েরা কোন বিষয়ে দুর্বল হয় যার দরুন তারা ক্লাসে যেতে ভয় পায় ওরূপ ছেলে-মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত Tution উপকারী সাব্যস্ত হতে পারে। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে, কোন কোন ছেলে-মেয়ে অংকে এবং বিজ্ঞান যেমন পদার্থ বিদ্যা, রাসায়ন শাস্ত্র ও জীব-বিজ্ঞানে দুর্বল হওয়ার কারণে ভাল নম্বর লাভ করতে পারে না। তার দরুন তারা ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারে না। যদি কোন জামাতে কেউ এ সকল বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী থাকেন অথবা পড়াতে পারেন ও সময় দিতে পারেন, তাহলে সান্ধ্যকালীন ক্লাস অথবা বন্ধের দিনে ক্লাস অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা করে দেখা উচিত। যাতে এ ক্লাস গুলোতে ওয়াকেফীনকে 'মিম্মা রাযাকনাহুম ইউন ফিকূন' অর্থাৎ আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে-এর অধীনে বিনিময় বা পারিতোষিক ছাড়া দীনী খিদমতের উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে পড়ান যায়। সাম্প্রতিককালেই একটি দেশের ওয়াকেফীন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল যে, তাদের মধ্যে অধিকাংশের শিক্ষাগত অবস্থা দুর্বল। দায়িত্ববান বন্ধুদেরকে ওরূপ পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়েদের এ ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শনের এবং কার্যতঃ তাদের সাহায্যের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর একটি আকার বা ব্যবস্থা হচ্ছে কোচিং ক্লাসের আয়োজন। যারা কোনও আকারে ওয়াকেফীনের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারেন এরূপ বন্ধুদের উচিত তারা যেন স্থানীয় জামাতকে তাঁদের যথাসাধ্য খিদমত পেশ করেন।

ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে শুরু থেকেই তাদের ঝোঁক ও অনুরাগের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত এবং তাদেরকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে থাকা ও সচেতন করতে থাকা উচিত যে, তারা হচ্ছে খোদাতাআলার পথে উৎসর্গীকৃত এবং তাদের কাছে কী কী প্রত্যাশা রয়েছে। যখন তারা বড় হয় তখন তারা যেন তাদের জামাতের ক্যারিয়ার প্লানিং কমিটি-এর নিকট দিক-নির্দেশনা চায় তাদের জন্য কোন্ পেশা উত্তম হতে পারে।

ওয়াকেফীনে নও অত্যন্ত দামী সন্তান। কেননা, তাদের কাঁধে ভবিষ্যৎকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলী অর্পিত হবে। তাদের তা'লীম-তরবিয়ত (শিক্ষা-দীক্ষা)-এর দায়িত্ব নেযামে জামাত এবং পিতা-মাতা উভয়ের ওপরে ন্যস্ত হয়।

খোদা করুন, যেন নেযামে জামাত এবং সকল পিতা-মাতা, যারা নিজেদের সন্তানকে দীনের খিদমতের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করেছেন তারা তাদের দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন এবং প্রিয় প্রভু ও নেতা হুযূর (আইঃ)-এর আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে মনোযোগী হন এবং নিজেদের এই মহান দায়িত্ব সম্পাদনে এরূপ উজ্জ্বল সফলতা লাভ করতে পারেন যাতে খোদাতাআলার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি তাদের ওপর পড়তে থাকে, আমীন।

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সংবাদ

হবিগঞ্জ মৌলভীবাজার জেলার কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ০১/০২/২০০২ইং হবিগঞ্জ মৌলভী বাজার জেলার স্থানীয় কায়েদগণকে নিয়ে ১ম ত্রৈমাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় চান্দপুর চা বাগান মজলিসে। এতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতামীম ইশায়াত। এতে বড়চড়, জামালপুর ও চান্দপুর চা বাগান মজলিস অংশগ্রহণ করেন।

-আনোয়ার হোসেন চৌধুরী,
জেলা কায়েদ, হবিগঞ্জ মৌলভী বাজার জেলা

বৃহত্তর সিলেট জেলার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে বৃহত্তর সিলেটের ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা গত ২১ ও ২২শে মার্চ ০২ সুনামগঞ্জ জেলার ইসলামগঞ্জ মজলিসে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। বাদ ফজর থেকে শুরু করে বাদ জুমুআ সমাপনী অধিবেশনের মধ্যে দিয়ে শেষ করা হয়। মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন জনাব সুলতান আহমদ। এছাড়া ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব আব্দুল জলিল, মাহবুব আজম রেজা, আজিজুল হক ও এস, এম, মাহমুদ, মোয়াল্লেম। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সহ খোদ্দাম আতফাল আনসার ও লাজনাগণ ইজতেমায় সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন। এতে চান্দপুর চা বাগান, জামালপুর (হবিগঞ্জ), সিলেট সদর ও ইসলামগঞ্জ মজলিস অংশগ্রহণ করেন।

- মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, চেয়ারম্যান
৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা কমিটি ২০০২, সিলেট জেলা

১লা মে আতফাল দিবস পালন

গত ১লা মে, ২০০২ আতঃ আঃ ডোহান্ডা আতফাল দিবস পালন করে। আতফাল দিবসের গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন ১। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হাকিম উদ্দিন চৌধুরী, ২। মৌঃ মনিরুজ্জামান ভূইয়া, মোয়াল্লেম। কায়েদ সাহেবের বক্তৃতার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ করার পর বিভিন্ন খেলাধূলা, কুরআন তেলাওয়াত, নযম, মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।

বাদ যোহর ও আসর নামায বা-জামাতে আদায় করার পর সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন (১ম স্থান অধিকারকারী আতফাল) সালেহ আহমদ (সুমন)। নযম পাঠ করেন (১ম স্থান অধিকারকারী আতফাল) রনি। আতফালদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব, মোয়াল্লেম সাহেব এবং কায়েদ সাহেব। পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে উক্ত আতফাল দিবস শেষ হয়।

- মনিরুজ্জামান ভূইয়া, মোয়াল্লেম

হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ শহীদের শাহাদতের পর তাঁর পরিবারের উপর অত্যাচারের ইতিবৃত্ত

মূল ঃ সৈয়্যদ মীর মাসুদ আহমদ

(চতুর্থ ও শেষ কিস্তি)

আফগানিস্তানের তৃতীয় যুদ্ধ এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমীর আমানুল্লাহ্ খানের জেহাদ ঘোষণা ঃ

আমীর আমানুল্লাহ্ খান বাদশাহ্ হওয়ার পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। একে আফগানিস্তানের তৃতীয় যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধে আফগানিস্তানের নিয়মিত সেনা বাহিনী ছাড়া বিভিন্ন গোত্র ও সাধারণ জনগণকে জেহাদের আহ্বান জানানো হয়। আফগানরা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার তিনটি সীমান্ত আক্রমণ করে। একটি আক্রমণ তোড়কা এলাকায় অর্থাৎ কাবুল থেকে পেশোয়ারে যাওয়ার রাস্তা বরাবর, দ্বিতীয় কান্দাহারের নিকট থেকে এবং তৃতীয়টি আফগানিস্তানের দক্ষিণ দিক থেকে অর্থাৎ খুশ্‌তের নিকট থেকে কোহাটের দিকে করা হয়।

এ আক্রমণের নেতৃত্ব দেন জেনারেল মুহাম্মদ নাদীর খাঁ। প্রথমে আফগানিস্তান আক্রমণ করায় প্রাথমিক অবস্থায় তাদের বিজয় হয় এবং বৃটিশ ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। জেনারেল মুহাম্মদ নাদীর খাঁ সেনাবাহিনী ও গোত্রের সর্দারদের সহায়তায় কোহাট জেলার টল পর্যন্ত দখল করেন।

শেরদীল খানের ছেলে আতা মহম্মদ খান এ সময় খুশ্‌তের হাকিম ছিলেন। তিনি সাহেবযাদা আব্দুস সালাম জানকে এই জেহাদে অংশ নেয়ার পরামর্শ দেন। সাহেবযাদা আব্দুস সালাম সাহেব তাঁর পঞ্চাশ জন খাদেম সহ টল এলাকায় যুদ্ধে অংশ নেন। আফগানরা টল দখল করে নেয়। তখন পবিত্র রমযান মাস। ইংরেজরা যুদ্ধে মোকাবেলা করে। এবং পিছন থেকে সৈন্য এনে আফগানদের অগ্রযাত্রা বন্ধ করে দেয়। কিছু পুরাতন বিমান ইংরেজরা এ যুদ্ধে ব্যবহার করে। টল ও কাবুল প্রভৃতি স্থানে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়। এতে আফগানিস্তানে শঙ্কা ও ত্রাসের সৃষ্টি হয়। অনেক জীবন হানি ঘটে। আমীর আমানুল্লাহ্ খান যুদ্ধ বন্ধের জন্য সম্মত হন। তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধ বন্ধের জন্য জানান। প্রথমে ইংরেজরা তা প্রত্যাখ্যান করে। পরে যুদ্ধ বন্ধের জন্য রাজি হয়। দু'পক্ষ থেকে প্রতিনিধিগণ রাওয়ালপিন্ডিতে মিলিত হয়।

আফগানিস্তানের পক্ষে সর্দার আলিজান খান প্রতিনিধিত্ব করেন। দু'পক্ষই যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি করে। এ যুদ্ধে আফগানিস্তানের বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি। আমীর আমানুল্লাহ্ খানের ধারণা ছিল যে, এ চুক্তির ফলে তিনি ডুরন্ড লাইনের কিছু এলাকা যা সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের অন্তর্গত আছে আফগানিস্তানের অন্তর্গত করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু ইংরেজরা তাদের অবস্থানে অনড় থাকে এবং ইঙ্গ-ভারতীয় কোন এলাকা আফগানিস্তানকে দিতে অস্বীকার করে।

আমীর আব্দুর রহমান খান ও আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের সময় থেকে আফগানিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল না। বৈদেশিক সম্পর্ক ইংরেজ সরকারের মাধ্যমে করতে হত। এজন্য আফগানিস্তানের আমীরগণ ইংরেজদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকার ভাতা পেতেন। ইংরেজরা যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে আফগানিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্কের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। ফলে আফগানিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ইংরেজরা আমীরদের ভাতা দেয়া বন্ধ করে দেয়। আফগানিস্তানের প্রতিনিধি আলী জান খানকে এ সব শর্ত মেনে নিয়ে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়। আমীর আমানউল্লাহ্ খান তাঁর সকল অভিপ্রায় থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এবং তাঁর সৈন্য বাহিনী ইংরেজদের বিপক্ষে যুদ্ধে ভাল না করার জন্য বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং সর্দার আলী জানের ওপর অসন্তুষ্ট হন। তাঁর বিচারে চুক্তি করার ক্ষেত্রে তিনি অকৃতকার্য হয়েছেন এবং ডুরান্ড লাইনের কোন এলাকা আফগানিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করতে অসমর্থ হন। যখন সর্দার আলী জান খান কাবুলে ফেরত আসেন, তখন তিনি আমীরের রোষানলে পড়েন। এ চুক্তি ১৯১৯ সালের ১৪ই আগষ্ট রাওয়ালপিন্ডিতে সম্পাদিত হয়। আমীর আমানুল্লাহ্ খান সর্দার আলী জান খানকে কাবুলে নজরবন্দী করে রাখেন। এ নজর বন্দী কয়েক বছর স্থায়ী হয়।

দক্ষিণাঞ্চলের শাসনকর্তাদের সাথে সাহেবযাদাগণের সম্পর্ক ঃ

কিছুদিন পর জেনারেল নাদির খাঁ-র ভাই শাহ মাহমুদ খানের বিয়ে আমীর আমানুল্লাহ্ খানের বোন করুন্নেছা সাহেবার সাথে হয়। এ ব্যক্তি দক্ষিণাঞ্চলের শাসনকর্তা মনোনীত হন। তিনি পাকতিয়া প্রদেশের রাজধানী গরদীজে অবস্থান করেন। এলাকা পরিদর্শনের সময় তিনি খুশ্‌তেও আসেন। তাঁর শিকারের শখ ছিল। সেজন্য সৈয়্যদগাহের কাছে এক বাগানে তিনি তাঁবু স্থাপন করেন। কোন কারণে শাহ মাহমুদ খান ও তাঁর স্ত্রী হযরত সাহেবযাদাদের পরিবারের উপর অসন্তুষ্ট হন। সেজন্য তাঁরা রাতেই তাঁবু উঠিয়ে চলে যান। যাওয়ার সময় সাহেবযাদাদের ধমক দিয়ে যান যে, তাদের শায়েস্তা করে দেবেন।

এর কিছুদিন পর শাহ মাহমুদ খানের পাকতিয়া থেকে কাবুলে যাওয়ার আদেশ আসে। তাঁকে আফগানিস্তানের অন্য এক স্থানে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠানো হয়। আর এ বিপদ কেটে যায়।

এরপর আমীর উদ্দীন খান শাসনকর্তা হয়ে আসেন। তিনি গুজরাটের অধিবাসী ও ভাল লোক ছিলেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, আমাদের পরিবারের কিছু লোককে প্রশাসনে চাকুরী করা উচিত। তখন আমি (সাহেবযাদা সৈয়্যদ আবুল হোসেন কুদসী সাহেব) সেক্রেটারী এবং সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব জান সাহেব খাজাঞ্চি হিসাবে নিয়োগ পাই। আমীর উদ্দিন সাহেব প্রায় তিন বছর খুশ্‌তের হাকিম ছিলেন। আমাদের কোন রকম কষ্ট হয় নি। এ সময়ে আমীর আমানুল্লাহ্ খান দক্ষিণাঞ্চল পরিদর্শনে আসেন। তিনি গরদীজে বক্তব্য রাখেন যে, আহমদীরা ভাল লোক। যে শাসকদের অধীনে তারা থাকে তাদের অনুগত হয়ে থাকে। আমি এ সব লোকদের পসন্দ করি।

আহমদীদের সম্পর্কে আফগানিস্তানের শাসকদের কঠোরতা অবলম্বন এবং অত্যাচার ও জুলুমের ঘটনাবলী ঃ

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ খুশ্‌ত, পাকতিয়া এবং মালহাক্কা এলাকার মঙ্গল,

গদরান, চমকনী প্রভৃতি অধিবাসীরা আমীর আমানুল্লাহ্ খানের সংস্কারমুক্ত নীতি ও সংশোধনকে তাদের ধারণা অনুসারে শরীয়ত ও কুরআনের পরিপন্থী বলে অভিহিত করে। তারা আমীরের উপর কেবল কুফরীর ফতোয়াই লাগায় নি উপরন্তু তাদের ধারণা অনুসারে তাঁকে তারা কাদিয়ানী হিসাবে গণ্য করে। এ বিদ্রোহের নেতা ছিল গোল্লামোল্লা, আব্দুল্লাহ্ মোল্লা এবং তার জামাই মোল্লা আব্দুর রশিদ। তারা দক্ষিণাঞ্চলের অন্য মোল্লা ও পীরদের সাথে একত্র হয়ে প্রকাশ্যে অগ্নিসংযোগ, সংঘর্ষ ও বিদ্রোহ শুরু করে। খোশ্‌তের আহমদীদের এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণে সম্মত করানোর চেষ্টা চালায়।

কিন্তু বিদ্যমান শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আহমদীয়া জামাতের নীতিগত বাধা থাকাতে আহমদীরা সেই অবস্থায় এ বিদ্রোহ থেকে দূরে থেকে। বিদ্রোহীরা এ এলাকার আহমদীদের সম্পত্তি ও মালামাল ধ্বংস ও লুটপাট করে এবং মারপিট ও অত্যাচার চালায়। অনেক আহমদী জীবন বাঁচাতে বৃটিশ ইন্ডিয়াতে যেতে বাধ্য হয়। বিদ্রোহীরা প্রচার করে যে, প্রকৃতপক্ষে আমীর আমানুল্লাহ্ নিজেই কাদিয়ানী। সেজন্য আহমদীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি। আর মৌলভী নিয়ামত উল্লাহ্ খানের নেতৃত্বে কাবুলে আহমদীয়া মিশন অবস্থিত। যদি আমানুল্লাহ্ খান আহমদী না হতেন তাহলে তাঁর উচিত ছিল কিছু আহমদীকে হত্যা করা। যেমন তার পিতা আমীর হাবিবুল্লাহ্ খান এবং দাদা আমীর আব্দুর রহমান খান আহমদীদের হত্যা ও সঙ্গেসার করেছে।

এ সময় আমীর আমানুল্লাহ্ খান সর্দার আলী আহমদ জানকে নজরবন্দী থেকে বার করে দক্ষিণ আফগানিস্তানের বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠান। সর্দার আলী আহমদ জান বিদ্রোহীদের সাথে সমঝোতায় আসেন এবং তাদের দাবী মেনে নেন। আমীর আমানুল্লাহ্ খান কুরআন ছুঁয়ে শপথ করেন যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। তখন বিদ্রোহীরা কাবুলে যাওয়ার জন্য সম্মত হয়, এ সময় আমীর আমানুল্লাহ্ খানও আহমদীদের উপর অত্যাচার শুরু করিয়ে দেন। ১৯২৬ সালে আহমদী মুবাল্লেগ মৌলভী নিয়ামত উল্লাহ্ খানকে সঙ্গেসার করে শহীদ করা হয়। দু'জন আহমদী মৌলভী আব্দুল হামিদ সাহেব ও কারী নূর আলী সাহেবকে ১৯২৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী একই দিনে সঙ্গেসার করা হয়। খোদার ফযলে এ তিনজন আহমদীয়তের জন্য সাহসিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করেন। যদিও এ সময় পর্যন্ত হযরত সাহেবযাদা সাহেবের পরিবারের উপর অত্যাচার শুরু হয় নি। কিন্তু এর কিছু দিন পর তাঁদের উপরও অত্যাচার শুরু হয়।

হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ শহীদ (রাঃ)-এর বংশধরদের আফগানিস্তান ত্যাগ, ভারতে আগমন এবং কাদিয়ান দর্শনের অবস্থা ঃ

এ সম্পর্কে আল্ ফযল পত্রিকায় লেখা হয় "আহমদীয়তের জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদ সাদেক হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ সাহেব মরহুমের দুই সাহেবযাদা সৈয়্যদ আবুল হোসেন সাহেব ও সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব কিছু দিনের জন্য কাদিয়ানে আসেন। তাঁদের দেখে আনন্দ ও ভালবাসার সাথে সাথে তাঁদের বুযূর্গ পিতার শাহাদতের ঘটনা তাজা হয়ে ওঠে এবং সকলে অভিভূত হয়ে পড়েন। সাহেবযাদাদের চেহারায় সৌন্দর্য ও ভদ্রতার জ্যোতিঃ ছিল। তাদের চালচলন আহমদীয়তের প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসা ও আনুগত্যের নিদর্শন ব্যক্ত হতে থাকে। যেহেতু তাঁদের বুযূর্গ পিতার আহমদীয়তের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ ও শাহাদাৎ বরণ জামাতের পবিত্র আবেগের সাথে সম্পৃক্ত তাঁদের এ সময় পর্যন্ত জীবন ও আহমদীয়তের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী তুলনাহীন ঘটনাসমৃদ্ধ সেজন্য "আল্ ফযল" পত্রিকার সম্পাদক তাদের খেদমতে এ অনুরোধ রাখেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন, যাতে জামাতের সদস্যগণ এ সম্পর্কে জেনে তাদের ঈমানের উন্নতি ঘটাতে পারে এবং তাদের মনে পবিত্র আবেগের সৃষ্টি হয়। জনাব নেক মুহাম্মদ খান সাহেব সাহাযাদাগণের এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন যা সকলের ঈমানের মজবুতীর জন্য নীচে দেয়া হল ঃ

সাহেবযাদা আবুল হোসেন কুদসী সাহেব বর্ণনা করেন, আমাদের পরিবার আমীর আমানুল্লাহ্ খানের সিদ্ধান্তে খুশ্‌তে ফেরত আসে। আমরা আমাদের সম্পত্তি ফেরত পাই। এভাবে চার বছর কেটে যায়। তারপর আমীর আমানুল্লাহ্ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আমরা সরকারের অনুগত ছিলাম। সরকারী লোকদের সাথে এলাকার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিদ্রোহ থামানোর চেষ্টা করতাম। সেজন্য বিদ্রোহীরা আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয় এবং বাগানের গাছ পালা কেটে নষ্ট করে। এ বিদ্রোহ মূলতঃ আহমদীদের বিরুদ্ধে হয়। আর আমরা ওখানের প্রসিদ্ধ আহমদী বিধায় সরকার সৈয়্যদ মীর আকবর সাহেব, সৈয়্যদ আবুল হোসেন সাহেব, শেখ আব্দুস সামাদ সাহেব ও আমীন গুল সাহেবকে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় রাখে। সাতদিন পর জামিনে দু'জনকে ছেড়ে দেয়া হয়। অন্য সকলকে কয়েদ রাখা হয়। আমরা ১৯ মাস কয়েদ থাকি। এ সময় দোগড়ী এলাকায় শান্তি ছিল। এ এলাকার লোক আমীরের পক্ষে ছিল। এজন্য খানদানের অন্য লোকদের ঐ এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এ সময় সাহেবযাদা মুহাম্মদ তৈয়ব জান সাহেব মুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় খুশ্‌তের প্রভাবশালী লোকেরা সরকারের কাছে আমাদের জন্য দরখাস্ত করেন যা পূর্বেও তারা করেছিলেন। এর ফলে প্রাদেশিক উজির একদিকে লিখিত আদেশ দেন যে, এদের ক্ষমা করে দেয়া হোক। অন্যদিকে যে স্থানীয় হাকিমের নেগরানীতে আমাদের রাখা হয়েছে তাকে আদেশ দেয় যে, "ওদের ছেড়ে দিও না। আমার কাছে পাঠাও। আমি তাদের কাবুলে নিয়ে যাব"। এ হাকিমের নাম ছিল গুল মুহাম্মদ। উজির আরও লেখে যে, সাহেবযাদা মুহাম্মদ তৈয়ব জান ও সাহেবযাদা আব্দুস সালাম জানকে গ্রেফতার করো। এমনকি তাদের সমস্ত খানদানের লোকদের। হাকিমের কাছে এ দু'টো পরস্পর বিপরীত আদেশ আশায় তিনি সাহেবযাদা মুহাম্মদ তৈয়ব জানকে বলেন, আমি উজিরের কাছে জানতে চেয়েছি এ দু'টো বিপরীত আদেশের অর্থ কী, কোন্‌টি পালন করতে হবে। এর উত্তর আসার পর তোমাকে জানাবো।

এ অবস্থা দেখে সাহেবযাদা মুহাম্মদ তৈয়ব জান সাহেব রাতের মধ্যে দোগরীতে তাঁর পরিবারের কাছে পৌছান। সেখানে তিনি দেখেন যে, তাঁর ভাই সাহেবযাদা আব্দুস সালামের গ্রেফতার করার জন্য তিনজন ফৌজের ঘোড় সওয়ার এসেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ খানদানের সকল সদস্যকে নিয়ে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যে ভাই কয়েদ খানায় ছিলেন তিনিও বলে দিয়েছিলেন, "আমাকে আল্লাহ্‌র হাওয়ালা করে অন্য কোন স্থানে চলে যাও"।

এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সৈয়্যদ আব্দুস সালাম রাত ১২টায় পরিবারের লোকদের নিয়ে বাড়ীর একদিক থেকে বার হন। এ সময় ফৌজী ঘোড়া সওয়ার বাড়ীর অন্য দিকে ছিল। সাহেবযাদা মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব বাড়ীর দ্রব্যাদি ঠিকঠাক করে সকালে অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ী থেকে বার হন। যখন ৩ জন ঘোড় সওয়ার আমাদের বাড়ীর থেকে চলে যাওয়া সম্পর্কে অবহিত হয় তখন তারা গ্রামের চৌকিদার ও অন্যান্য লোকদের সাথে নিয়ে আমাদের খোঁজে বার হয়। সকালে গরীজ নামক স্থানে আমাদের গ্রেফতার করা হয়। আমাদের আবার গ্রামে আনা হয়। মেয়েদের ও শিশুদের বাহরাম নামে এক শরীফ ব্যক্তির জামানতে ছেড়ে দেয়া হয়। পুরুষদের কয়েদ করে খুশ্‌তের ছাউনীতে নেয়া হয়। কিছুদিন পর খুশ্‌তের হাকীম বদলী হয়। তখন আমরা আবেদন করি যে, আমরা নিরপরাধ। আমাদের ছেড়ে দেয়া হোক। এর প্রেক্ষিতে তিনি আমাদের কাছে জামানাত চান। জামানত পত্র দেয়ার পর তিনি বলেন, আমি সাহেবযাদা আব্দুস সালাম জানকে তো নিজেই ছেড়ে দিলাম। আর দু'জনের ছাড়ার জন্য প্রধান হাকিমের কাছে লিখবো ও জামানতনামা পাঠাবো। এর উত্তরে প্রধান হাকিম জানান যে, খুশ্‌তের লোকেরা আহমদীয়তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং আহমদীয়তের জন্য তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এজন্য খুশ্‌তের সর্দারদের সাথে পরামর্শ করা হোক যে, তাদের ছেড়ে দেয়া যায় কিনা? খুশ্‌তের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন, 'আমরা তাদের কোন দোষ দেখি না। এরা নিজেরা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। সরকারের বিরুদ্ধে কোন সময় কোন কাজে অংশ গ্রহণ করে নি। তাদের মরহুম পিতার সময় থেকে তারা সরকারের অনুগত ও সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করছেন'। তখন আমাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এ ঘটনার এক সপ্তাহও হয় নেই। খুশ্‌তের গভর্ণর আদেশ পাঠান যে, তাদের গ্রেফতার করে কাবুলে পাঠানো হোক। এখন সৈয়্যদ আবুল হোসেন কুদসী সাহেবকে গ্রেফতার করে খুশ্‌তের ছাউনীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানের জেলা হাকিম জামানত নিয়ে তাকে এজন্য ছেড়ে দেয় যে, তিনি যেন অন্য ভাইদের নিয়ে আসেন। সৈয়দ আবুল হোসেন কুদসী সাহেব বাড়ীতে ফেরার পর পরিবারের সকলে এ অবস্থায় কি করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ করেন। শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু আমাদের সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ভাল বলে মনে হচ্ছে না সেজন্য আমাদের এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া উচিত।

সুতরাং ১৯২৬ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে এ পরিবার বনু এলাকায় যেখানে এদের জায়গীর ছিল চলে আসে। দ্বিতীয় বার যখন সাহেবযাদাগণকে গ্রেফতার করা হয় তার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সৈয়্যদনা হযরত খলীফা মসীহ্ সানী (রাঃ) মির্যা নেক মুহাম্মদ সাহেব গযনভীকে কাদিয়ান থেকে তাদের খবর নেওয়ার জন্য পাঠান। পরিবারের সকলে বনু এলাকাতে এলে তাঁদের খোশ আমদেদ জানানোর জন্য আবারও হুযূর (রাঃ) নেক মুহাম্মদ খান সাহেবকে বনু এলাকায় পাঠান। হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের দুই ছেলে সৈয়দ আবুল হোসেন কুদসী সাহেব ও সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব খান সাহেব তাঁর সাথে আসেন।

১৯২৬ সালে যে সব ব্যক্তি আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে বনু এলাকার নওরঙ নামক স্থানে আসেন তার মধ্যে হযরত সাহেবযাদা সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদের বংশের ১৩জন ছিলেন।

তারা হলেন ১। সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম জান সাহেব। ২। সাহেবযাদা সৈয়্যদ আহমদ আবুল হোসেন কুদসী সাহেব ৩। সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব জান সাহেব ৪। মরহুম হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের সম্মানিতা স্ত্রী (যিনি সাহেবযাদা মুহাম্মদ তৈয়ব জানের মা) ৫। সাহেবযাদা সৈয়দ মুহাম্মদ সৈয়্যদ জান শহীদ কাবুলের পুত্র সাহেবযাদা মুহাম্মদ হাশেম জান। ৬। সৈয়্যদ হাশেম জান সাহেবের স্ত্রী (৭-৮) সৈয়্যদ হাশেম জান সাহেবের দু'মেয়ে (৯-১০) সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম জান সাহেবের দু'ছেলে যারা হলেন সৈয়্যদ হেবতুল্লাহ্ ও সৈয়্যদ হেমায়েত উল্লাহ্ ১১। হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদের বোন। (১২-১৩) বোনের দু'ছেলে আব্দুর রব সাহেব ও আব্দুল কুদ্দুস সাহেব।

১৯২৬ সালে এদের মধ্যে দু'জন সাহেবযাদা অর্থাৎ সাহেবযাদা সৈয়্যদ আহমদ আবুল হোসেন কুদসী সাহেব ও সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব কাদিয়ানে এসে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের বক্তব্য "হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় হুযূর আমাদের সাথে যেরূপ ভালবাসা ও আন্তরিকতার পরিচয় দেন তাতে আমাদের ওপর আপতিত সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেলাম। আমরা হুযূরের ভালবাসা ও করুণার শোকরিয়া আদায় করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এ আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, খোদাতাআলা আমাদের এ পবিত্র স্থান দর্শন করার সুযোগ দিয়েছেন যেখান থেকে আমাদের শহীদ পিতা নূর পেয়েছেন। আর আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রাঃ) কদমবুসীর সৌভাগ্য অর্জন করেছি।"

দৈনিক আল্ ফযল পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রকাশিত হয় "সুধী মন্ডলী! এ খবর পড়ে অনুমান করতে পারছেন, সাহেবযাদাগণ নিজেদের অবস্থা বর্ণনার সময় তাঁদের দুঃখ-কষ্টের কথা কম বলেছেন, যদিও তাঁদের কাছে অনুরোধ করা হয় যে, যেহেতু তাদের ওপর যেসব জুলুম ও নির্যাতন করা হয়েছে তা জামাতের জন্য ঈমানবর্ধক ঘটনা, সেজন্য যেন তাঁরা আফগানিস্তানের রীতিকে অগ্রাহ্য করে এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেন। যাহোক তাঁরা যেটুকু বর্ণনা করেছেন সেটাও কম নয়। এতে তাঁদের হিম্মত, সততা ও ঈমানী দৃঢ়তার নিদর্শন আছে। সকলে দোয়া করুন যে, শহীদ মরহুমের বংশধরদের যেন খোদা তাঁদের পিতার উজ্জ্বল প্রতিভূ করেন এবং যেন তাঁদেরকে কল্যাণ ও নৈকট্য দান করেন যার জন্য তাঁরা এরূপ ভয়ঙ্কর এবং দীর্ঘ কষ্ট ও দুঃখের মোকাবেলা করেছেন।"

হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ শহীদের পুত্র সৈয়্যদ তৈয়বজান সাহেবের এ স্বপ্ন বয়াতকারী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ

১৯২৬ সালের ৩১ মার্চের রাত। আমি পেশোয়ার শহরে ঘুমিয়ে আছি। হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে স্বপ্ন দেখলাম। হুযূর (আঃ) দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসে আছেন। হুযূরের আশে পাশে অনেক আফগান বসে ও দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর সামনে আমরা তিন ভাই আব্দুস সালাম, আহমদ আবুল হোসেন ও আহমদ তৈয়ব বসে আছি। হুযূরের সব থেকে বেশি নিকট আছেন আবুল

হোসেন। যিনি এখন কাদিয়ানে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। এ অবস্থায় আমরা তিন ভাই হুযূর (আঃ)-এর নিকট বয়াত করার জন্য দরখাস্ত পেশ করি। হুযূর (আঃ) বলেন, আমি নই অন্য এক ব্যক্তিকে তোমাদের বয়াত নেয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমরা আশে পাশের আফগানদের বললাম, তোমরা উর্দূতে হুযূর (সঃ)-এর কাছে আমাদের পক্ষ থেকে বিনীত আবেদন কর যে, আমরা হুযূরের হাতে বয়াত করাকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ মনে করছি। এ বলার পর হুযূর (আঃ) উর্দূতে আমাদের উত্তর দেন, "আমার ও এই ব্যক্তির নিকট বয়াত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তৎক্ষণাৎ আমার মুখ থেকে এ বাক্য বার হল, এই ব্যক্তির মর্মার্থ হল হুযূর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব। তখন আমি নীরব রইলাম। এ অবস্থায় হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে যে সব আফগান উপস্থিত ছিলেন। তাদের একজন হুযূরের (আঃ) পবিত্র নাম এভাবে নিলেন, "হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতো ওয়াস্ সালাম, এছাড়া আর কিছু বললেন না। এ কথার পর আমার নিশ্চিত একীন হল যে, হুযূর (আঃ) তার ওপর সন্তুষ্ট হলেন। তিনি (আঃ) ওই ব্যক্তির দিকে ভালভাবে দেখলেন, আমি স্বপ্নেই নিজের মনে মনে বললাম, হুযূরের ওপর দুরূদ পড়ার পর হুযূরের চুপ থাকা এবং বারণ না করা থেকে জানা যাচ্ছে যে, মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং সাহেবযাদা সাইফুর পেশওয়ারী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নবুওয়ত ও খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর খেলাফতের অস্বীকার করার কারণে ভুলের মধ্যে আছেন। কারণ দুরূদ শরীফ রসূল ও নবীদের উপর পড়া সুন্নত (আল্ ফযল, মে ১৯২৬)।

সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব জানের বনু জেলার নওরঙ্গে ফেরত এবং সাহেবযাদা সৈয়্যদ আবুল হোসেন কুদসীর দীনী শিক্ষার জন্য কাদিয়ানে অবস্থান ঃ

আল্ ফযল পত্রিকায় ছাপ হয়

হযরত আব্দুল লতীফ সাহেবের ছেলে সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব বনু জেলার নওরঙ্গে ফেরত যান। তাঁর ওপর পরিবারের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়ের সমস্ত দায়িত্ব ছিল। তাঁর অন্য ভাই সাহেবযাদা আবুল হোসেন সাহেব দীনী শিক্ষা গ্রহণের জন্য কাদিয়ানে অবস্থান করেন।

হযরত সাহেবযাদা মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেবের সম্মানিত স্ত্রীর ইন্তেকাল ঃ

১৯৩৯ সালের ১২ই নভেম্বর আল্ ফযল, কাদিয়ান-এর বর্ণনা ঃ

অত্যন্ত দুঃখ ও আফসোসের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, হযরত শহীদ আব্দুল লতীফ সাহেবের সম্মানিতা স্ত্রী শাহজাহান বিবি, ১লা নভেম্বর আসরের নামাযের পর ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ... রাজেউন)। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তিন মাস অসুস্থ ছিলেন। মরহুমা খুবই মুখলিস ও তেজস্বী আহমদী। যখন হযরত সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ সাহেবের মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক শাহাদতের ঘটনা কাবুলে ঘটে তখন তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত রাখেন। এরপর নিজের ছোট বড় সব সন্তানদের আহমদীয়তের শিক্ষা দেয়া এবং আহমদীয়তের সত্যতার প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করেন। কাবুলের সরকার ছাড়াও পরিবারের কিছু ব্যক্তি সব রকম অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে। তারা মুখালেফাত করার ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেয় নি।

মরহুমা সব সময় বলতেন, "আহমদীয়তের জন্য আমার ছোট ছোট বাচ্চা এমনকি আমাকেও যদি মেরে ফেলে দেয়া হয় তবে খোদার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আমার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সামান্যতম তারতম্য ঘটাবো না। মরহুমার এই মনোবলের ও দৃঢ়চিত্ততার জন্য তাদের ওপর বিপদ-আপদের পাহাড় নেমে আছে। কিন্তু খোদার ফযলে সকল বিপদ লতাপাতার মত উড়ে যায়। তিনি নিজের বিশ্বাসে কৃতকার্য হয়েছেন। হযরত আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদের পরিবারে খোদার ফযলে আহমদীয়ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সকল বংশধর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখেন। মরহুমা নামায ও রোযায় খুবই পাবন্দ ছিলেন। তিনি তাঁর সম্পত্তির $^{১}/_{৩}$ অংশ ওসীয়্যত করেন। ১৯২৬ সালে যখন থেকে এ পরিবার খুশ্ত থেকে সীমান্ত প্রদেশ আসেন। প্রতি বছর তিনি কাদিয়ান জলসা সালানায় যোগদান করতেন। অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর ইচ্ছা ছিল কাদিয়ানে আসার এবং বেহেশ্‌তি মকবেরাতে দাফন হওয়ার।

আমরা হযরত সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ সাহেবের বুযূর্গ স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত পরিবারের সদস্যদের ভালবাসা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। দোয়া করি মরহুমাকে খোদা তাঁর নিজের নৈকট্যের উচ্চ মাকাম দান করুন। তাঁর বংশধরদেরও এ বেদনা সহ্য করার ধৈর্য দান করুন। সকলকে জানাযাতে শরীক হয়ে মরহুমার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আমাদের শিক্ষক সৈয়্যদ আবুল হোসেন কুদসী সাহেব খোদার ফযলে কাদিয়ানে অবস্থান কালে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। উর্দূ শেখেন এবং এ ভাষাতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মাদ্রাসা আহমদীয়া, কাদিয়ান, জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান এবং ভারত ভাগের পর আহমদনগরে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তানে মৃত্যুবরণ করেন এবং কাদিয়ানের বেহেশ্‌তি মকবারাতে সমাহিত হন। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল সানী (রাঃ) তাঁর বিবাহ হযরত মাওলানা আব্দুল মাজেদ ভাগলপুরীর পরিবারে করান। খোদার ফযলে তাঁর বংশধর আছে।

[সাপ্তাহিক আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল থেকে]

অনুবাদ - **কওসার আলী মোল্লা**

ঈর্ষা নিয়ে কথা

ঈ বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ বিভাগের চতুর্থ অক্ষর। দীর্ঘ উচ্চারণে অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়। অক্ষরটি যখন শব্দের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয় তখন তার মধ্যে নিজ অবয়বকে সঠিক রেখে আত্মপ্রকাশ করে। আর শব্দের মধ্যে বা অন্তে স্থান লাভ করলে অন্যরূপ ধারণ করে। 'ী' এই রূপটির মধ্যে কিছু দূরভিসন্ধি আছে নইলে এরূপ ধারণ করার উদ্দেশ্য কী? আমার রুচি বোধের মানদন্ডে দেখছি নিজ আকারে স্থান লাভ করে আপন অস্তিত্বকে জাহির করার অহমিকার ঈর্ষানলে লিপ্ত। আসল অবয়ব ত্যাগ করে 'ী' রূপ দেখে মনে হয় মাথাতে কিছু দূরভিসন্ধি আছে। নইলে মাথা পাক দেয়া থাকবে কেন? যাক নিজেকে প্রকাশ করার যে প্রকৃতিজাত শক্তি সেটা বাস্তবে আমরা সকল

ক্ষেত্রে দেখতে পাই। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

সমাজে বসবাস করে আমরা যদি অনুসন্ধিৎসু নিয়ে অনুসন্ধান করি তাহলে দেখা যাবে নিজের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য অনেক সময় ন্যায় -অন্যায়ের সঙ্গে আঁতাত করে আমাদের চলতে হয়। প্রথমতঃ তো আমরা কারো ভাল দেখতে পারি না। সামনে সামনে বিরোধিতা করার শক্তি না থাকলেও চুপিসাপে ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত হই। তা-ও যদি সম্ভব না হয় তবে তো ঈর্ষানলে দগ্ধিভূত হই। এ ঈর্ষাকে অনেক সংগোপনে পোষণ করে থাকি। কারণ এ এক মারাত্মক ব্যাধি। তাই অনেক কলা-কৌশলে চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এমন ভাব প্রকাশ করি যেন কেউ টের না পায়। কিন্তু সকলের মধ্যেই এ রোগের জীবাণু অল্প বিস্তর বিরাজ করছে। সে জন্য চালাকীর শেষ সীমায় পৌঁছে বাহাদূরীর তমঘা আঁটতে আমরা সকলেই তৎপর। বিশেষ কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে জন্ম লাভ করেন যাদের মধ্যে ঐ ব্যাধির মারাত্মকরূপ অবদমিত থাকে। তাঁরাই আমাদের আদর্শ। এদের অনুসরণ করলে আমরা মন্দগুণের প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারি।

ঈর্ষা করার প্রবণতা আমাদের মাঝে থাকে কেন? মনে হয় ঈপ্সিত বস্তুকে না পাওয়ার কারণে এ রোগের প্রাদুর্ভাব। যদি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে দেয়ার মানসিকতা তৈরী হয় তাহলে এরোগ মারাত্মক রূপ ধারণ করবে না। কেউ ভাল আছে। ভাল পরছে। বাড় বাড়ন্তে টই টুম্বর! এসব দেখে শুনে অসংযত মানুষ ঈর্ষানলে দগ্ধিভূত হয়। তারা চিন্তা করে না যে, তার নিজস্ব দুর্বলতা কোথায় লুকায়িত রয়েছে। আর চিন্তার অপারগতা হেতু সঠিক ঔষধের নির্বাচন হয় না। ফলে ঈর্ষা নামক পেটেন্ট ঔষধ ব্যবহার করতে থাকে। তখন নিজেকে এমন প্রতিযোগিতার সামনে এনে দাঁড় করায় যে, জ্বলে পুড়ে ছাই হতে থাকে। অসুখ ভাল হওয়া তো দূরের কথা অসুখ বেড়েই চলে। তাতে মনের শান্তি নামক বস্তুটি দূর থেকে দূরে নির্বাসিত হতে থাকে। যে শান্তির চরণ ধূলায় নিমগ্ন হয়ে জীবনকে সার্থক করতে চায় তা তখন সুদূর পরাহত। সুন্দরের আবাহন তো হয় না বরং অশুভের বেহায়াপনা মাতব্বরীতে সুস্থ মন ব্যস্ততায় পর্যবসিত হয়। তাই মনে করি ভোগের লালসায় উন্মুক্ত না হয়ে ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে এ রোগ উপশমিত হবে। আমরা তো উপদেশ দানে কলম যুদ্ধে অবতীর্ণ হই বা সভা-সমিতিতে বড় বড় নৈতিকতার বুলি আওড়িয়ে নিজেকে জাহির করি। সাধারণে মনে করে কি সুন্দর উপদেশই না দিল! কিন্তু দুঃখের বিষয় যদি সেই ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করার সুযোগ কখনও আমাদের হয় তাহলে এসব কিছুই বুলিসর্বস্ব। তিনি উপদেশ দানে পটু কিন্তু তাঁর ব্যবহারিক জীবনে তা পরিস্ফুট হয় না। নিজে পালন না করে অন্যের উপদেশ দেয়া মূর্খতা ছাড়া আর কি? আর এতে সুফল তো হয় না বরং সমালোচনার সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়েন। নিজেকে সংযত রেখেই অন্যকে সংযত করা বাঞ্ছনীয়।

পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-দ্বেষ এসব মানব মনের গভীরে লুকায়িত থাকে। সুস্থ মানুষ এসব গুণ বা অপগুণ যা-ই বলুন, একে কাজে লাগান অতি কৌশলে। এ সবের মধ্যে নিজের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন অতি উত্তম। মনে করুন কেউ ন্যায়নিষ্ঠা জীবন যাপন করছেন। তাঁকে দেখে আমার মনে ঈর্ষাকাতরতা দেখা দিল। আমি যদি সেই সময় ঈর্ষাকাতরতাকে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির জীবনের চেয়েও আরও উন্নতমানের ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারি এই প্রতিযোগিতা কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমার মনে হয় ঈর্ষাকাতরতাকে সাধুবাদ। কারণ প্রতিযোগিতা এমন হবে যাতে প্রতিযোগিতার মধ্যে উন্নতমানের পরিণাম লাভ হয়। তাই বোধ হয় আল্লাহ্‌ক পাক আমাদের ওপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। যাতে আমরা সেগুলো ভাল কাজে ব্যবহার করতে পারি এবং আমাদের উদ্দেশ্য যেন সাধু হয়। যখনই আমরা এসব আহত কাজে ব্যবহার করবো তখন তার মধ্যে যে তিক্ততা আছে তা-ই আমাদের লাভ হবে। সত্যিকার নিষ্ঠা হতে হবো বঞ্চিত। যেমন দরুন 'বিজ্ঞান'। এই বিজ্ঞান আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী অনেক উন্নতি সাধন করেছে অপর দিকে দেশকে ধ্বংসের দিকেও নিয়ে যাচ্ছে, যেমন বোমা বিভিন্ন শক্তিশালী অস্ত্র ইত্যাদি এসব আবিষ্কার হয়েছে বিজ্ঞানের ফলেই। যদি আমরা চিন্তা করে দেখি দোষ কার, তাহলে অবশ্যই সবাই বলবো যে, দোষ বিজ্ঞানের নয় দোষ আমাদের নিজের। দোষ আমাদের প্রয়োগের, কৌশলের। তেমনি আমাদের জানতে হবে আল্লাহ্‌ পাক আমাদের মধ্যে যা কিছু দিয়েছেন আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তে। কিন্তু আমরা ব্যবহার বিধি জানি না বিধায় ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। আর ব্যবহার বিধি জানার জন্য সৎসঙ্গ আবশ্যক। মহামানবের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁরা এসেছেন ধরার বুঝে ঐ অশুভ শক্তিকে শুভ শক্তিতে পরিণত করে মানব জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। তাই প্রত্যেকটি মহামানব নমস্য। আমরা অনেকেই জানি আর্সেনিক বিষাক্ত সাপের বিষ হতে তৈরী করা হয়। এ ঔষধটি যখন অবসাদগ্রস্থ, বিষাদগ্রস্ত, হতাশায় জর্জরিত এবং অন্যমনষ্ক রোগীর ক্ষেত্রে মাত্রা মাফিক ব্যবহার হয় তখন ইহা সেবনে রোগী আরোগ্য লাভ করেন। তাই বলে সব অসুখে ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে না। উপযুক্ত ডাক্তারের উপযুক্ত পরামর্শমত ব্যবহারে সুফল পাওয়া যাবে না। উপযুক্ত ডাক্তারের উপযুক্ত পরামর্শমত ব্যবহারে সুফল নির্ধারিত। তাই 'ঈর্ষা' যদিও খুবই খারাপ। কিন্তু উপযুক্ত প্রয়োগকারীর তত্ত্বাবধানে প্রয়োগ হলে ভাল ছাড়া মন্দ নেই। আমাদের জীবনে যদি এমন করি যে কোন ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ছে, আর আমি পড়ছি না আবার সে আমার থেকে আর্থিক দিক দিয়েও অনেক উপরে এ অবস্থায় যদি আমি ঈর্ষা করি যে, আমিও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বো এবং ভাল কাজ ও ঐ পথে অর্থ উপার্জন করবো তা হলেই হবে নেকের ঈর্ষা।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত আমরা যা কিছু করি না কেন তার লক্ষ্য যেন ভালোর প্রতি থাকে। উদ্দেশ্য যদি ভাল হয় ফল ভাল হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে জন্য ঈর্ষা, হিংসা-দ্বেষকে দূরে সরিয়ে না রেখে মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করলে ফল ভাল হবে। তবে সবকিছুতে প্রয়োগ বিধি জানা আবশ্যক। প্রথমে বিবেচনা করে নিতে হবে যে সম্পর্কে আমি ঈর্ষাভাব হৃদয়ে সৃষ্টি করতে যাচ্ছি তা কি আমার ঈমানের উন্নতির কারণ না অবনতির কারণ, যদি তা ঈমানের উন্নতির কারণ হয় তা হলে ঈর্ষা করা যাবে। তবে যার সাথেই ঈর্ষা করা হোক না কেন তার সাথে কোন মতেই শত্রুতামি করা যাবে না। তাই আসুন আমরা সবাই ঈর্ষা, হিংসাকে অপব্যবহার না করে সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করি। ঈর্ষা করলে তা যেন সঠিক পথে করতে পারি আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সেই তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মাহমুদ আহমদ সুমন
মোয়াল্লেম

অদৃশ্য ওহীর বাস্তব রূপায়ন

'ওহী' আরবী শব্দ, এর অর্থ হলো ঃ "ইশারা, গোপন সংবাদ, পত্রালাপন, গোপনে কারো হৃদয় পটে কোন বিষয় সৃষ্টি করা, কারো নিকটে প্রেরিত পয়গাম, (আরবী অভিধান আল্ কাওসার)। সুফীগণের মতে ওহী এমন এক বিষয়, যার সাহায্যে আশেক আর মাশুকের মাঝে নির্জনের ভাবের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। ওহীর মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে বান্দার আদান-প্রদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে কুরআন করীমে বলা হয়েছে ঃ **ওয়ামা কানা লি-বাশারিন আইঁ-ইউকাল্লিমাহুল্লাহু ইল্লা ওয়াহ্ ইয়ান আওমিউ ওয়ারায়ী হিজাবীন আও ইউরসিলা রসূলান ফাইউহিয়া বিইযনিহী মা-ইয়াশায়ু"**। অর্থঃ কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে বাক্যালাপ করবেন। কিন্তু কেবল ওহীযোগে অথবা পর্দার অন্তরাল হতে অথবা দূত প্রেরণ করে যে তাঁর আদেশ মোতাবেক উহা ওহী করে যা তিনি ইচ্ছা করেন (সূরা শূরা ঃ ৫২)।

ওহীর বিষয়টির মধ্যে একটি গোপন পর্দা রয়েছে। সাধারণ মানুষের বাহ্যিক জ্ঞান ও চোখ দ্বারা পর্দার অন্তরালের রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর নয়। পর্দা ভেদ করতে হলে জাগতিক জ্ঞানের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজন। মানবদেহটি একটি চামড়ার কভার দ্বারা মোড়ানো। এর অভ্যন্তরে রয়েছে আত্মা, এ আত্মা-ই জীবনের মূল রহস্য। চামড়ায় মোড়ানো দেহটির বল বৃদ্ধির জন্য যেমন নানা প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে আত্মার উন্নতির জন্যও এক প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন। আত্মার উন্নতি বা পুষ্টিসাধনের জন্য বেশি বেশি খোদাতাআলার স্মরণে নিমগ্ন হওয়া প্রয়োজন।

যে ব্যক্তি যত বেশি আল্লাহ্‌র স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয় তার আত্মা ততবেশি উন্নতি অর্জন করে থাকে। উন্নতিপ্রাপ্ত আত্মাগুলোই কেবল মাত্র ওহীর রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হয়। মানুষের বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও শক্তির যেমন পার্থক্য রয়েছে। তদ্রূপ পার্থক্য রয়েছে আত্মার মাঝেও। খোদার দিদার ও সান্নিধ্যে লাভে উন্নয়নশীল আত্মাসমূহ হতে, আল্লাহ্ যাঁকে পসন্দ করেন, তাঁকেই জগতের পাপী-তাপী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ওহীর পাত্র হিসেবে নির্বাচিত করেন। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্‌র নির্বাচিত ব্যক্তিগণকেই রসূল বলা হয়। এ রসূলগণের সাথেই সাধারণতঃ আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে কথা-বার্তা বলে থাকেন। এ কথা বলার পদ্ধতি অনেকটা বর্তমান যুগের টেলিফোন সংলাপের ন্যায়। যা শুধু মাত্র দুই প্রান্তের রিসিভার ধারণকারী ব্যক্তিদ্বয়ের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। নবী-রসূলগণ যে সব ওহী লাভ করেন উহা সাধারণ মানুষ তখনই বাস্তবরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যখন স্বচক্ষে উহাকে প্রতিফলিত হতে দেখতে পায়। হযরত আদম (আঃ) হতে আরম্ভ করে আফযালুর রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) পর্যন্ত আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যতজনকে ওহীর পাত্র হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে যাঁর অবস্থান, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর শান ও মাকাম সম্বন্ধে কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে, **ইয়া আয়ুহান্নাবীয়ু ইন্না আরসাল্‌নাকা শাহিদাঁ ওয়া মুবাশ্‌শিরাঁ ওয়া নাযীরা ওয়াদায়িইয়ান ইলাল্লাহি বিইযনিহী ওয়া সিরাজাম মুনীরা** (সূরাতুল আহ্যাব ঃ ৪৬-৪৭)। অর্থ ঃ হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশ মোতাবেক তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে। সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু যেমন সূর্য, আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য তেমনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। নবীগণ ও ঐশী সংস্করণের জন্য আকাশমন্ডলের সূর্য তিনিই। নবী ও সংস্কারকগণ হুযূর (সঃ)-কে ঘিরে তাঁরই চারিদিকে আবর্তিত হন এবং তাঁরই নিকট হতে আলো সংগ্রহ করে থাকেন। পবিত্র কুরআন করীমের সূরা ফুরকানের দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ **তাবারাকাল্লাযী নায্‌যালাল ফুরকানা আলা আবদিহী লি ইয়াকুনা লিল্ আলামীনা নাযীরা**। অর্থ ঃ সেই সত্তা পরম বরকতের অধিকারী যিনি স্বীয় বান্দার উপর নাযিল করেছেন ফুরকান যেন সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারীতে পরিণত হয়। মুহাম্মদ (সঃ) এমন একজন নবী যিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বের মানবমন্ডলীর মুক্তির সন্ধান বাতলিয়ে গিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর উপরে পবিত্র কুরআন সহ অগণিত ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। সময় ও জ্ঞানের সল্পতার কারণে ওহীর ঐ বিশাল ভান্ডার নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয় বিধায়, আখেরী জামানা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বা প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন সংক্রান্ত কতিপয় ওহীর উপরেই আজকের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। আখেরী জামানায় পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্বন্ধে সূরা তাকভীর পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছেঃ **ওয়া ইযাল ইশারু উত্তিলাত্** অর্থ ঃ এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উট্‌নীগুলি বেকার হবে। হুযূর (সঃ) বলছেন ঃ **ওয়ালা ইউতরাকুন্নাল কিলাসূ ফালা ইউসয়া আলায়হা** (মুসলিম)। অর্থ ঃ এবং উষ্টিগুলি পরিত্যক্ত হবে। ঐগুলোতে চড়ে সফর করা হবে না। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতে এমন এক জামানা আসবে যখন আরবের মত মরুভূমিতেও উট্‌নীর প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ উন্নত ও দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন আবিষ্কার হবে। মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে, মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নতি করবে যে, তারা চল্লিশ বছরের কাজ এক বছরে, এক বছরের কাজ এক মাসে, এবং এক মাসের কাজ এ সপ্তাহে, এক সপ্তাহের কাজ একদিনে, এক দিনের কাজ এক ঘন্টায়, এক ঘন্টার কাজ এক মিনিটে সমাপ্ত করবে। হাদীস হতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, এক সময় মানুষের কান লম্বা হবে। তারা নিজ গৃহে বসে দূরের মানুষের কথা শ্রবণ করবে। সমস্ত জগতটা মানুষের পরিবারে পরিণত হবে, ইত্যাদি।

অর্থাৎ পৃথিবীতে এক সময় অত্যাধুনিক দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহনসহ রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিপি, স্যাটেলাইট, ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার ইত্যাদি আবিষ্কার হবে। এ সমস্তই হবে ইসলাম ধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার কার্যের তরক্কীর জন্য। যেমন কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে ঃ

হুওয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিলহুদা ওয়াদীনিল হাক্কী লি ইউজহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহী ওয়া লাওকারীহাল মুশরিকূন (সূরাতুস সাফ্‌ফ)। অর্থ ঃ তিনি তার রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত ধর্মসহ যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে দেন, মুশরিকরা যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন? আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন মুফাস্‌সিরীনের ধারণা মোতাবেক আফযালুর রসূল, খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দ্বারা ইসলামের যে বীজ বপিত হয়েছিল এর চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সর্বপ্রকার অত্যাধুনিক উপায় উপকরণের মহাসমাহারের যুগ-সন্ধিক্ষণে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ে হযরত মসীহ্

মাওউদ (আঃ) -এর আগমনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে সূরা মুয্যাম্মিলের ১৬ আয়াতের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করতে হবে। উক্ত আয়াতে হুযূর (সঃ)-এর রিসালাত সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, **ইন্না আরসালনা ইলায়কুম রসূলান, শাহিদান আলায়কুম কামা আরসালনা ইলা ফিরআওনা রসূলা**। অর্থ ঃ নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি একজন রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম একজন রসূল। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতের আত্মশুদ্ধি ও তওরাতের শিক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর ওফাত প্রাপ্তির চৌদ্দশ' বছর পর যেভাবে তাঁর উপর নাযিলকৃত শরীয়তের অধীনস্থ হয়ে হযরত ঈসা (আঃ) মুসায়ী মসীহ্ হিসাবে আগমন করেছিলেন, সেভাবে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর উম্মতের আত্মশুদ্ধি এবং পবিত্র কুরআন করীমের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে উম্মতের মধ্য হতে এক ব্যক্তি মূসায়ী মসীহের গুণে গুণান্বিত হয়ে মুহাম্মদী মসীহ্ হিসেবে আগমন করছেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতি হতে যেমন কতিপয় ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে পর্যায়ক্রমে বনী ইস্রাঈলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে ঠিক একইভাবে মুহাম্মদী মসীহের উপরও মুসলিম সম্প্রদায় হতে কতিপয় ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং পর্যায়ক্রমে সমগ্র বিশ্বের সকল ধর্ম ও মতের উপর বিজয় লাভ করবে। সূরা তাহরীমের ১২-১৩ আয়াত হতে প্রতীয়মান হয় যে, খাতামুন্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত হতে কোন কোন ব্যক্তি অবশ্যই হযরত মরিয়ম ও ইবনে মরিয়মের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবেন। হুযূর (সঃ) বলেছেন, **কায়ফা আনতুম ইযানাযালাবনু মারইয়ামা ফীকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম** (মুসলিম)।

অর্থ ঃ তখন কেমন হবে যখন ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন এবং তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের ইমাম হবে। উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে মুহাম্মদী উম্মতে জন্মগ্রহণকারী মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর লাহোর শহরে বিশালাকার এক জনসমাবেশে পঠিত ভাষণে বলেন, "সূরা তাহ্‌রীমে উম্মতের কোন কোন ব্যক্তিকে ইবনে মরিয়ম নামে ভূষিত করা হয়েছে। কেননা, তাঁদেরকে মরিয়মের সাথে প্রথমে তুলনার পর মরিয়মের ন্যায় তাদের মাঝে রূহ ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে তাঁরা মরিয়মী সত্তার যোগ্যতা লাভ করবে এবং এ সত্তা হতে উন্নতি সাধন করে ইবনে মরিয়মে (ঈসা আঃ) রূপান্তরিত হবেন। এই মোতাবেক বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ওহীতে প্রথমে আমাকে মরিয়ম নামে ভূষিত করে বলেন, **ইয়া মারইয়ামু উস্‌কুন আনতা ওয়া যাওজুকাল জান্নাহ্** অর্থাৎ হে মরিয়ম! তুমি এবং তোমার বন্ধুরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তিনি পুনরায় বলেন, ইয়া মারইয়ামু - নাফাখ্‌তু ফীকা মিররুহিস্ সিদকে। অর্থ ঃ হে মরিয়ম! আমি তোমার মধ্যে সত্যের রূহ্ ফুৎকার করেছি।" আবার আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন, **ইয়া ঈসা ইন্নি মুত্তাওয়াফ্‌ফিকা ওয়া রাফেউকা ইলাইয়্যা** অর্থাৎ হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে স্বাভাবিক (পবিত্র) মৃত্যু দান করব এবং আমার দিকে উঠিয়ে আনবো। সুতরাং এ স্থলে আমাকে মরিয়মী অবস্থা হতে উন্নীত করে আমার নাম ঈসা রাখা হয়েছে। এবং এভাবে আমাকে ইবনে মরিয়ম উপাধি প্রদান করা হয় (লেকচার লাহোর)। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা ইবনে মরিয়মে পরিণত করে তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সঃ) এবং স্বীয় ওহীর বাস্তবতাকে জগদ্বাসীর নিকট দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার করেছেন। মুহাম্মদী মসীহের আগমনের সময় জগতের অবস্থা ও তাঁর বংশের বিষয়ে হুযূর (সঃ) সূরা জুমুআর আয়াত ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম। আয়াত সম্বন্ধে সাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর কাঁধে স্বীয় হস্ত মোবারক রেখে বলেন, "লাও কানাল ঈমানু ইনদাস্‌সুরাইয়া লানালাহু রিজালুন আওরাজুলুম মিন্‌হাউলায়ি" (বুখারী কিতাবুত্ তাফসীর) অর্থ ঃ ঈমান যদি সুবাইয়া নক্ষত্রেও চলে যায় তথাপি, এদের (অর্থাৎ পারশ্য) বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি অবশ্যই তথা হতে উহাকে নামিয়ে আনবেন।" মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) মূলতঃ হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর এলাকা পারশ্য হতে হিজরত করে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে বসতিস্থাপনকারী বিখ্যাত মোগল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এর ফলে হুযূর পাক (সঃ)-এর ইলহামী হাদীসটি দিবালোকে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় স্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার হাজার হাজার নিদর্শনের মধ্যে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ একটি আজিমুশ্‌শান নিদর্শন। হুযূর (সঃ) বলেন, **ইন্না লি মাহ্‌দীনা আয়াতায়নি লামতাকূনামুনযু খালাকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি ইয়ান কাসিফুল কামারু লিআওয়ালি লায়লাতিম মির-রামাযানা ওয়া তান কাসিফুশ্ শামসু ফিন্‌নিসফি মিনহু** (দারকুতনী)।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমার মাহ্‌দীর সত্যতার জন্য এমন দু'টি নিদর্শন রয়েছে যা আসমান-জমীন সৃষ্টি অবদি অদ্য পর্যন্ত অন্য কারো জন্য নিদর্শনরূপে প্রদর্শিত হয় নি। উহা হলো একই রমযানের চন্দ্র গ্রহণের প্রথম রজনীতে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের মধ্য তারিখে (অর্থাৎ উভয় গ্রহণের মধ্যে ১৫ দিনের ব্যবধানে) সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হবে। উল্লেখ্য, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) নীরবে নিভৃতে খোদার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এমন সময় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ তারিখে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে নির্জনতা ভঙ্গ করে লোক সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করার নির্দেশ প্রদান করতে যেয়ে বলেন, "কুল ইন্নী উমিরতু ওয়াআনা আওয়ালুল মু'মিনীন।" অর্থ ঃ তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং এই বিষয়ে আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী। এরপর তিনি খোদার হুকুমে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইমাম মাহ্‌দী এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ সকল জল্পনা-কল্পনার অবসানকল্পে খোদার হুকুমে নিজেকে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হিসাবে ঘোষণা প্রদান করেন। উক্ত ঘোষণার সাথে সাথে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেলো। কেউ ফিস্‌ফিসিয়ে কেউ আবাব চিৎকার করে বলতে থাকলো মির্যা সাহেব যদি প্রকৃত পক্ষেই সত্য মসীহ্ ও মাহ্‌দী হয়ে থাকেন তবে আসমানে চন্দ্রে-সূর্যের গ্রহণ লাগছে না কেন? এমতাবস্থায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) মানবমন্ডলীর ঈমানী দাবি মোতাবেক আসমান-জমিনের মালিক মহান স্রষ্টার নিকট নির্জন বাসে হৃদয় নিংড়ানো দোয়াতে রত হলেন। এরপর সত্যসন্ধানীগণের ঈমানের হেফাযত আর শয়তানদের শয়তানী চিরতরে রুদ্ধ করতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধে ঐ অসাধারণ গ্রহণ সংগঠিত হয় (আজাদ, উর্দূ লাহোর ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৫, সিভিল এন্ড মেলেটারী গেজেট ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ইং)।

দীর্ঘকাল যাবৎ যারা ওহীর আগমন বন্ধ বলে বিশ্বাস করতো, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর দাবীর স্বপক্ষে এবং মানব কল্যাণে হাজার হাজার ওহী লাভ করে ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাসের খন্ডন করেছেন। নিম্নে এমন কিছু ওহী উপস্থাপন করছি সেগুলো ইতোমধ্যে দিবসে উদিত সূর্যের ন্যায় প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

১। আফগানিস্তানের বিষয়ে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা ওহী করেন ঃ

"শাতানে তুযবাহানে ওয়া কুল্লুমান আলায়হা ফানিন।" অর্থ ঃ দু'টি ছাগল জবাই করা হবে এবং সব কিছুই মরণশীল" (তাযকেরা)।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর জীবদ্দশাতে শুধু মাত্র আহমদীয়ত গ্রহণের কারণে হযরত মৌলবী আব্দুর রহীম (রাঃ)-কে শ্বাসরুদ্ধ করে এবং সাহেবযাদা হযরত মৌলবী সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ সাহেব (রাঃ)-কে মোল্লা মৌলবীদের হটকারী ফতোয়ার বশবর্তী হয়ে তৎকালীন আমীর আব্দুর রহমান ও হাবীবুল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে প্রস্তরাঘাতে শাহাদত বরণ করানোর মাধ্যমে উক্ত ওহীটি পূর্ণ হয়।

২। হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান এবং সাহেবযাদা হযরত মৌলবী সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ সাহেব (রাঃ) দ্বয়ের নৃশংস হত্যাকান্ডের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় ওহীটি নাযিল হয়েছিল– "রিয়াসত কাবুল মেঁ করীব পঁচাশী হাজার আদমী মরেঙ্গে"(১৩ই এপ্রিল, ১৯০৭ সন) (তাযকেরাহ্)। উল্লেখ্য, মৌলভী আব্দুর রহমান ও সাহেবযাদা মৌলবী সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদত লাভের পর আফগানিস্তানে ব্যাপকাকারে কলেরা মহামারী দেখা দেয় যার কারণে শুধু মাত্র কাবুলেই পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি লোকের প্রাণহানি হয়।

৩। তৃতীয় ওহী- "তিন বকরে যবাহ্ কিয়ে জায়েঙ্গে" অর্থ ঃ "তিনটি ছাগল জবাই করা হবে (তাযকিরাহ্)। এই ওহীটি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর ১৯২৪ সনে আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে তিনজন মোখলেস আহমদীকে আহমদীয়ত গ্রহণের কারণে তার হুকুমে পাথরের আঘাতে শহীদ করার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। যাদের শহীদ করা হয় তাঁরা হলেন ঃ সর্বজনাব মৌলবী নিয়ামতুল্লাহ্ খাঁন (রাঃ) মৌলবী আব্দুল হালিম (রাঃ) এবং মোল্লা নূর আলী (রাঃ)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৯০৬ সালে আফগানিস্তানের শাহাদতের উপরে তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়েন নামক পুস্তক রচনা করতে গিয়ে এতে দু'জন আহমদীর উপর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের বর্ণনা একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যার অর্থ।

"হে কাবুলের মাটি! তুমি সাক্ষী থাক যে, তোমার উপর এ রকম অমানুষিক অত্যাচার সংঘটিত হলো। হে হতভাগা স্থান! তুমি খোদার দৃষ্টিতে অভিশপ্ত হয়েছেঅ কারণ এ ভূমিতে এমন চরম জুলুমের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে। উল্লেখ্য, আফগানিস্তানে আহমদীয়তের উপর ভয়াবহ জুলুম আর নির্যাতনের পরিণতির ফলশ্রুতিতেই প্রায় শত বর্ষ যাবৎ অশান্তির অনল দাউ দাউ করে জ্বলছে। এ আগুন চীন, জার্মান, ইংল্যান্ড আর আমেরিকার পক্ষে নিভানো সম্ভব নয়। এ আগুন তখনই নিভে যাবে যখন আফগানবাসী তাদের পূর্বসূরীদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসাবে গ্রহণ করে খোদার দরবারে তওবা আর দোয়ার মাধ্যমে ক্ষমার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৪। চতুর্থ ওহী হিসাবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন উহার উল্লেখ করেই প্রবন্ধের ইতি টানছি ঃ

১৯০৫ সনে তদানিন্তন দিল্লীর গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন সাহেব বঙ্গদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে বৃটিশ পার্লামেন্টও সিদ্ধান্তের প্রতি অনুমোদন প্রদান করেন। এর ফলে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের ফরমান জারী করেন। এতে বাংলার জনস্বার্থের উপর বিরাট আঘাত আসে যার সুবাদে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন খারাবী শুরু হয়। এর ফলে অগণিত মানুষের প্রাণহানি হয়। বাঙ্গালীরা সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এ আদেশ বাতিলের জোরালো দাবী পেশ করতে থাকে। এমনকি পর্যায়ক্রমে ভারতবর্ষের সর্বত্র বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মানুষ গর্জে উঠে। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর স্যার ফুলার কঠোর হস্তে সেই আন্দোলন দমনের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হাজার হাজার আন্দোলনকারী বাঙ্গালী নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এমতাবস্থায় ঐ আদেশ রহিত করার মূলতঃ কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬ সনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর উপর ওহী নাযিল হলো ঃ পহেলে বাঙ্গালা কে নিসবাত জোকুছ হুকুম জারী কিয়া গিয়া থা, আব উনকী দিলজয়ী কি জায়গী" (তাযকিরাহ্)। অর্থ ঃ ভঙ্গ সম্বন্ধে প্রথমে যে আদেশ জারী করা হয়েছে উহা রহিত করা হবে। এবং বাঙ্গালীদের মনস্তুষ্টি করা হবে।"

সপ্তম এডওয়ার্ড হঠাৎ লন্ডনে মারা যান। তখন তার পুত্র পঞ্চম জর্জ বৃটিশ সম্রাট হিসাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এ মুহূর্তেও এ বিশ্বাস ছিল যে, বঙ্গভঙ্গ আদেশ কখনোই রহিত করা হবে না। অতঃপর ১৯১১ সনে পঞ্চম জর্জ রাজমাতা রানী মেরী ভারত সফরের পরিকল্পনা করেন এবং ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১১ সনে দিল্লীতে এক রাজ দরবার অনুষ্ঠানের আদেশ জারী করেন। উক্ত ঘোষণা মোতাবেক যথা সময়ে পঞ্চম জর্জ এবং রানী মেরী দিল্লীতে আগমন করেন এবং জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় দরবারে পঞ্চম জর্জ অপ্রত্যাশিতভাবে বঙ্গভঙ্গ আদেশ রহিত ফরমান ঘোষণা করেন। এভাবে ১৯০৬ সনের প্রাপ্ত ওহী ১৯১১ সনের ১১ই ডিসেম্বর পূর্ণতা লাভ করে। আবার ১৯৭১ সনে ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলা দেশের উৎপত্তি। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আরেকভাবে পনর্বিকাশ ঘটে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) মহান স্রষ্টার দরবারে নিজের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত হন, "দুনিয়ামে এক নযীর আয়া, পর দুনিয়ানে উস্‌কো কবুল না কিয়া, লেকিন খোদা উচেছ কবুল করেগা আওর বড়ে জোর আওর হামলোঁসে উসকি সাচ্চাই যাহের করে গা" (তায্‌কিরা) অর্থ ঃ দুনিয়াতে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। দুনিয়া তাঁকে গ্রহণ করে নি। কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং প্রচন্ড আক্রমণসমূহ দ্বারা তাঁর সত্যতাকে প্রকাশ করবেন।" ১৯০৬ সনে বিশ্বের বর্তমান নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে ওহীর সাহায্যে জগদ্ব্যাপী ঘোষণা করেন যে, "হে ইউরোপ, তুমি নিরাপদ নহ, হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ, হে দ্বীপবাসীগণ কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য পাচ্ছি। সেই এক এবং অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন। তাঁর সামনে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক। ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া আবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি এদেশের পালাও ঘনিয়ে এসেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে। লূতের যুগের দৃশ্য তোমরা অবলোকন করবে। খোদা শাস্তি প্রদানে ধীরে ঃ অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট। তাঁকে যে ভয় করে না সে জীবিত নহে মৃত"। উপরোল্লিখিত ওহীগুলোর বাস্তব রূপায়ন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। যাদের স্বচ্ছ অন্তকরণ রয়েছে হেদায়াত শুধু মাত্র তাদের নসীবেই জুটে থাকে।

- মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম

আল্লাহ্‌র এক নিদর্শন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘড়িলাল

আল্লাহ্‌তাআলা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর নিকট ইলহাম করেন, ম্যায় তেরি তবলীগ কো জমীনকে কিনারোঁ তক পৌঁহচাউঙ্গা" অর্থাৎ আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছাব।

আজ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি জামাতে আহমদীয়ার প্রতি লক্ষ্য করে তাহলে দেখতে পাবে আল্লাহ্‌তাআলা কীভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা দান করেছেন। এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার ছোট ছোট উদাহরণ আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এবং সে সাথে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আহ্‌বান করব আসুন এবং দেখুন আল্লাহ্‌তাআলা কীভাবে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণতা দান করেছেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট অপরূপ সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন সুন্দরবন। এ সুন্দরবনের পাশেই অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘড়িলাল। ভৌগলিক দিক থেকে পৃথিবীর স্থল ভাগের এক প্রান্তে অবস্থিত এ ঘড়িলাল জামাত। অর্থাৎ জামাতের পাশেই প্রকৃতির এক মায়ামুগ্ধকর অপার সৃষ্টি সুন্দরবন আর বনের পরেই অথৈ সমুদ্র।

এখানে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন সংবাদ কীভাবে পৌঁছেছে এ ঘটনা শুনলে প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তির ঈমান আরো বেড়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এ জামাতের প্রথম আহমদী মরহুম আব্দুল আজীজ তরফদার সাহেব। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুবই ধার্মিক। ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার সাথে সাথে তিনি প্রায়ই তাহাজ্জদ পড়তেন। কোথাও ওয়াজ মহফিলের কথা শুনলে বহুদূর পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে তিনি ধর্মের কথা শুনতেন। মরহুম আব্দুল আজিজ তরফদার সাহেবের মা ছিলেন খুবই পুণ্যবতী মহিলা। ছেলের এ অবস্থা দেখে তাঁর চোখ স্নিগ্ধতায় ভরে যেত। তিনি ছেলের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতেন।

একদিন তিনি পুত্রকে ডেকে বল্লেন, হে আমার পুত্র! শতধা বিভক্ত এই ধর্মহীনতার যুগে তুমি যদি সত্যকে পেতে চাও তাহলে হরিনগরে গিয়ে চেয়ারম্যান শামসুর রহমান সাহেবের সাথে দেখা কর। উল্লেখ্য, এটি ১৯৬৫ সালের ঘটনা। হরিনগর ঘড়িলাল থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সে সময় এ এলাকা ছিল খুবই দুর্গম। নৌকা ছিল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম আর শামসুর রহমান সাহেব ছিলেন ঐ অঞ্চলের চেয়ারম্যান এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট। মরহুম আব্দুল আজিজ তরফদার সাহেবের মাতা শামসুর রহমান সাহেবকে কখনো দেখেন নি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, **যালিকা ফাযলুল্লাহি ইউতীহি মাইইয়াশায়ু ওয়াল্লাহু যুলফাযলিল আযীম** অর্থাৎ ইহা আল্লাহ্‌র ফযল তিনি যাকে চাহেন ইহা দান করেন, এবং আল্লাহ্‌ পরম ফযলের অধিকারী (সূরাতুল জুমুয়া ঃ ৫)। মাতার আজ্ঞা পালনে পুত্র দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে গেলেন শামসুর রহমান সাহেবের কাছে। খুলে বল্লেন সবকিছু। শামসুর রহমান সাহেব আব্দুল আজীজ তরফদার সাহেবকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন সংবাদ জানালেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, **ফাইযা রাআইতুমুহু ফাবাইয়ুহু ওয়া লাও হাবওয়ান আলাছ ছালজি ফাইন্নাহু খালীফাতুল্লাহিল মাহদীয়ু** অর্থাৎ যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়াত করিও যদি বরফের উপর হামাগুঁড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্ মাহ্‌দী (সুনানে ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহদী) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আব্দুল আজিজ তরফদার সাহেব কাল বিলম্ব না করে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর বয়াত গ্রহণ করেন এবং নিজ গ্রামে ফিরে এসে গ্রামবাসীকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দাওয়াত দিতে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, **আহাসিবান্ নাসু আইইউত্‌রাকু আইয়া কূলূ আমান্না ওয়াহুম লা ইউফতানূন** অর্থাৎ লোকেরা কি ইহা মনে করিয়াছে যে, তাহাদিগকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যে, তাহারা বলে আমরা ঈমান আনিয়াছি অথচ তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না? (সূরাতুল্ আনকাবূত ঃ ৩)।

আব্দুল আজিজ তরফদার সাহেবের বেলায় তাই হ'ল। তীব্র বিরোধিতা শুরু হ'ল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধার (মাধ্যমে) এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফল-ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব; কিন্তু তুমি ধৈর্যশীলগণকে সু-সংবাদ দাও, যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আসিলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রভুর পক্ষ হতে আশীষ এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয়। এবং ইহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত (সূরাতুল বাকারাঃ ১৫৬-১৫৮)।

আব্দুল আজীজ তরফদার সাহেবের উপর আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ভয়-ভীতি এবং জীবননাশের হুমকী আসতে থাকল কিন্তু তিনি আহমদীয়ত ত্যাগ করলেন না এবং প্রচার হতেও বিরত রইলেন না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীরা ক্ষুধার মাধ্যমে কষ্ট দেয়ার জন্য আব্দুল আজীজ তরফদার সাহেবের ২৫ বিঘা জমির ধান পরপর দু'বৎসর কেটে নিয়ে গেল। তিনি গাভীর দুধ বিক্রি করে আলু ক্রয় করে খেয়েছেন, কিন্তু ঈমান ত্যাগ করেন নি।

এবার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আশীষ ও বরকতসমূহ বর্ষিত হতে শুরু করল। প্রচন্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও একের পর এক ব্যক্তি বয়াত করে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে মানতে শুরু করলেন। আল্লাহ্‌র ফযলে এ জামাতের বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় একশ'।

তরফদার সাহেব মারা যান ১১ মার্চ, ২০০১ সনে। মারা যাবার আগে ১৯৯৬ সনে তিনি জামাতের নামে দান করে যান ১ একর ৬৩ শতক (প্রায় ৫ বিঘা) জমি। আর এ বৎসর (২০০২ সনে) মরহুম আব্দুল আজীজ তরফদার সাহেবের বিবি জামাতের নামে দান করেন স্বামীর পক্ষ থেকে পাওয়া ১ একর ২২ শতক (সাড়ে ৩ বিঘা) জমি। মরহুম আব্দুল আজীজ তরফদার সাহেবের বড় ছেলে জনাব নজরুল ইসলাম সাহেব বর্তমানে ঘড়িলাল জামাতের প্রেসিডেন্ট। দোয়া করি আল্লাহ্‌তাআলা তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

গত ৩০ মার্চ, ২০০২ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব

ঘড়িলাল জামাত সফর করেন। আমীর সাহেবের সফর সঙ্গী ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের আমীর জনাব এস. এম. আবু কাউসার সাহেব, জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। এ সফরে তিনি আমাদের অনেকগুলি নজম গেয়ে শুনান। আল্লাহ্ আমাকে তৌফীক দিয়েছিলেন এ সফরে আমীর সাহেবের সঙ্গে থাকার।

সকাল ৮-৩০ মিনিটে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সুন্দরবন জামাত থেকে রওয়ানা হন মাইক্রোবাসে আর ৯.৩০ মিনিটে এসে পৌছান বুড়িগোয়ালিনীতে। খাকসার এবং ঘড়িলাল জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব আগেই এসে আমীর সাহেবের সফরের জন্য ট্রলার ঠিক করে রেখেছিলাম। বেলা ১০টায় আমরা ট্রলার করে নদীপথে যাত্রা করি। ঘড়িলাল জামাতের উদ্দেশ্যে। নদীর পাশে জনবসতি আর অন্য পাশে আল্লাহ্র মায়ামুগ্ধকর অপার সৃষ্টি সুন্দরবন। বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম একটি স্থান এই সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ ভূখন্ড জুড়ে দুর্গম অরণ্যে বিচিত্র জীবজন্তু, বাঘ ও হরিণের লীলাভূমি। এই সুন্দরবন বহুকাল ধরে দেশী-বিদেশী ভ্রমণ পিপাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। এর মোহময়ী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন ভ্রমণকারীরা। তবে একদিনে আপনি কখনো উপলব্ধি করতে পারবেন না এ অপরূপ সৌন্দর্যকে। স্বপ্নের-মায়াজাল বিছানো এই সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য আপনার বেশ কয়েকদিন প্রয়োজন। কষ্টকর হলেও এই ভ্রমণ আপনাকে দেবে এক রোমাঞ্চকর নতুন অভিজ্ঞতা। বনের পাশদিয়ে লঞ্চ, টলার অথবা নৌকা দিয়ে যাওয়ার সময় নদীর ধারে দেখবেন গোল পাতা গাছের সারি। গোলপাতা নাম শুনলে কেউ হয়ত প্রথমে ভাববেন এটি মনে হয় গোলাকার কোন পাতা, আসলে তা নয়। নারিকেলের পাতার মত দেখতে লম্বা, তবুও নাম গোলপাতা। কখনো দেখবেন বনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা হরিণের দল। বন মোরগের ডাকও শুনতে পাবেন। এই চিরসবুজ সুন্দরবনে আল্লাহ্তাআলা সকল নিবিড় সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছেন।

সুন্দরবনের মধু বিখ্যাত। যারা মধু আহরণ করে তাদেরকে বলা হয় মৌয়াল। মৌয়ালরা নৌকা করে দলবদ্ধভাবে সুন্দরবনে প্রবেশ করে। নৌকা নিরাপদ স্থানে রেখে মধুর নেশায় উপরের দিকে তাকিয়ে মধুর চাক খুঁজতে থাকে। এভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে পথ চলার সময় কখনো বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারাতে হয়। সারা বনে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট নদী। কখনো চোখে পড়বে নদীতে পানি খেতে আসা হরিণের দল। সে এক অপরূপ দৃশ্য। নদীর চরে শীতকালে কুমীরের রোদ পোহানোর দৃশ্যও চোখে পড়বে। বনে বানর আর হরিণের মধ্যে রয়েছে খুবই সখ্যতা। গাছে বানর নীচে হরিণ। বাঘ না দেখতে পারলেও জঙ্গলে দেখতে পাবেন সদ্য হেঁটে যাওয়া বাঘের পদচিহ্ন।

ট্রলারে বসে সুন্দরবন জামাতের আমীর সাহেব সুন্দরবন সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়েছেন।

নদীর বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রলার। কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ে নদীর তীরে ছোট বড় নাড়ী-পুরুষ মিলে বহু লোক বাগ্দা চিংড়ির রেনু পোনা ধরছে। এ পোনা এত ছোট যে আপনাকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। আর এ দৃশ্য একবার দেখলে অনেকদিন পর্যন্ত আপনার মনে থাকবে।

ঘড়িলাল জামাতে পৌছে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব প্রথমেই যান মরহুম আব্দুল আজীজ তরফদার সাহেবের বাড়ীতে। মরহুমের কবর যেয়ারত করেন। তারপর ঘুরে দেখেন তরফদার সাহেব এবং তাঁর বিবির জামাতের নামে দান করা সাড়ে আট বিঘা জমি। আমীর সাহেব যুহর এবং আসরের নামায আদায় করেন ঘড়িলাল জামাতের মসজিদে। আমীর সাহেবের আগমন সংবাদ শুনে ঘড়িলাল জামাতের আহমদীগণ মসজিদে একত্র হন। আমীর সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতা শেষে এক বন্ধু বয়াত করেন।

সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ফিরে আসেন সুন্দরবন জামাতে। আমীর সাহেব বলেন, আমাদের এ সফর কোন দুনিয়াবী সফর নয় এটি একটি আধ্যাত্মিক সফর। ঘড়িলাল জামাত সেই ইলহামেরই পূর্ণতা যা আল্লাহ্তাআলা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর উপর নাযেল করেন "ম্যা তেরি তবলীগকো জমীনকে কিনারোঁ তক পৌহচাউঙ্গা"।

- নাসের আহমদ আনসারী
মোয়াল্লেম

সংবাদ

সারা বাংলাদেশের স্থানীয় জামাতগুলোতে খেলাফত দিবসের সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত

খেলাফত ইসলামের মেরুদন্ডস্বরূপ। আল্লাহ্তাআলার ফযলে আহমদীয়া জামাত খেলাফতের এ কল্যাণ লাভে মহান আল্লাহ্র প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। ২৬শে মে, ১৯০৮ হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে ২৭শে মে, ১৯০৮ খেলাফত 'আলা মিনাহাজিন নবুওয়তের ধারায় পুনরায় ইসলামী খেলাফত আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন এ খেলাফতের চতুর্থ পর্যায় চলছে, আল্হামদুলিল্লাহ্।

অন্যান্য বছরের ন্যায় বাংলাদেশের স্থানীয় জামাতগুলো ২৭মে তারিখে খেলাফত দিবসের সভা-সম্মেলনের আয়োজন করে খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা, কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে। এ পর্যন্ত যাদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে তারা হলেন ঢাকা (মীরপুর মসজিদে), হোস-নাবাদ, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও তারুয়া জামাত।

- আহমদী বার্তা

রাজশাহী আঞ্চলিক নও মুবায়েঈন ক্লাস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেবাড়িয়া (নাটোর) মসজিদে গত ১৭ই মে হতে ২৩শে মে ২০০২ইং সাতদিন (৭ দিন) ব্যাপী আহ্বায়ক রাজশাহী আঞ্চলিক তবলীগ কমিটি মওলানা বশিরুর রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে "নও মোবায়েঈন" তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়,আল্হামদুলিল্লাহ্।

উক্ত ক্লাসে রাজশাহী, তেবাড়ীয়া কাফুরিয়া ও মহারাজপুর জামাত হতে মোট ২০ জন নও মোবায়েঈন অংশ গ্রহণ করে। এ ক্লাসে তরবিয়ত বিভাগ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় তা'লীম তরবিয়ত পুস্তক, কুরআন নাযেরা, অর্থসহ নামায, ইসলামী আদব, আমাদের শিক্ষা, আহবান ও তরবিয়তের গোড়ার কথা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়। এছাড়াও রাত ৯-১০ টা পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা হয়। প্রত্যেক বাদ ফজর হতে রাত ১০টা পর্যন্ত (নামায ও খাবারের সময় বাদে) ক্লাস চলে। উল্লিখিত ক্লাস পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, মোয়াল্লেম, জনাব মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম, মোয়াল্লেম ও খাকসার। শিক্ষা দান শেষে একটি লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সবশেষে মওলানা বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্র সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

- মুহাম্মদ আমীর হোসেন, প্রেসিডেন্ট

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রূপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 64 ◆ 22nd Issue

May 31, 2002 ◆ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST
FREQ. - 3660
S.R - 27500
POL - VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com